

# ANJALI 2025



Ma Durga





**SARBARI DAS**



**GET YOUR  
DREAM  
HOUSE**

**INTERO**  
A Berkshire Hathaway Affiliate

**Contact: 408-410-1729**

**Email: [sdas@interorealestate.com](mailto:sdas@interorealestate.com)**

**BRE#01390288**

**Intero Real Estate Services**

**Over 20 years of  
experience in Bay Area  
Real Estate Business**

**Home buying partner you  
can trust**

# Contents

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Contents.....</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>Acknowledgments.....</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>Editorial.....</b>                                             | <b>5</b>  |
| <b>Bengali Prose.....</b>                                         | <b>6</b>  |
| গল্প হলেও সত্যি.....                                              | 6         |
| সময়.....                                                         | 9         |
| র্যাটেলস্নেক ক্যানিয়নের গর্ভে.....                               | 12        |
| দিল্লি বিড়লা মন্দির.....                                         | 18        |
| <b>English Prose.....</b>                                         | <b>22</b> |
| Redemption Tales: The Bias Detector.....                          | 22        |
| In Conversation with Romen Chakrabarti.....                       | 29        |
| The Two Lives of Pumpkin: A Gourd's Journey Through Ayurveda..... | 32        |
| <b>Pashchimi Poets.....</b>                                       | <b>35</b> |
| সিঁদুরপথ.....                                                     | 35        |
| ফিরে এসো বিনয়.....                                               | 36        |
| দীপ নিভে যায়----.....                                            | 36        |
| <b>Pashchimi Picassos.....</b>                                    | <b>37</b> |
| Decorative Owl Art of Bengal.....                                 | 37        |
| The Calm Before the Storm of Rudra.....                           | 38        |
| Back Cover.....                                                   | 38        |
| Mini Picassos/Kids' Corner.....                                   | 39        |

# Acknowledgments

## **Pashchimi is thrilled to bring you Durga Puja 2025. along with our annual publication, Anjali 2025!**

A big shoutout to everyone who poured their creativity into Anjali—with poems, stories, and art that made our job of curating pure joy. We hope scrolling through the pages feels just as delightful for you as it was for us to put together.

This Puja wouldn't shine the way it does without the amazing support of our community. Your contributions—both in spirit and in funds—make it possible for us to celebrate Durga Puja at this scale. Having you with us for all five festive days truly means the world.

A huge thank you also goes to our sponsors, whose encouragement keeps us going strong year after year. Be sure to check them out during and after Puja—you'll find their details in this souvenir. Of course, none of this would be possible without our wonderful purohits. Their dedication keeps the rituals authentic and meaningful, and their explanations help connect us even more deeply to our traditions. Let's take a moment to thank our pujaris: Chandan Mukherjee, Sudip Majumdar, Shantanu Mukherjee, Biswapesh Chattopadhyay, and Debojit Ray.

We would like to pause and remember **Ramen Chakraborti**, our beloved priest and guiding angel. His wisdom, warmth, and devotion touched countless lives, and his absence this year leaves a space that can never truly be filled. We carry his blessings and memories with us into this Puja and beyond. As an homage to our dear Ramen-Da, we have included an interview with him (initially published in Anjali 2023) in this edition of the magazine.

We're also super excited for our cultural programs, this year's performers are ready to light up the stage and leave you spellbound! And finally, a very special thanks to our volunteers. You are the real heroes behind the scenes - the heartbeat of Pashchimi. Your time, energy, and love keep this celebration alive.

## **Here's to Durga Puja 2025 - let's make memories together!**

With love and gratitude,  
The Pashchimi Team

Cover Page: *Ma Durga* in color pencil by Sreedatri Suter (3rd grade)

Back cover: *Welcoming Our Daughter, Uma* by Debasmita Paul



# Editorial

As the beats of the *dhak* grow louder and the fragrance of *shiuli* fills the air, Durga Puja 2025 arrives once again to remind us of the eternal triumph of good over evil. Ma Durga, the timeless embodiment of courage and compassion, stands as our guiding light—not only in mythology but in the lives we lead today.

In a world grappling with conflict, inequality, and uncertainty, her image feels more relevant than ever. Just as she rose to defeat Mahishasura, we too are called to confront the challenges of our time—be it injustice, divisiveness, or despair. And yet, alongside these struggles, we see glimmers of hope: communities standing united for equality, young voices demanding a better tomorrow, and innovations that bridge distances and bring us closer together.

Durga Puja is more than a festival—it is a collective spirit, a reminder that resilience runs deep within us. It is about celebrating heritage while also embracing the possibilities of the future. This year, let us draw inspiration from Ma Durga's strength to not just endure the times we live in, but to reimagine them with optimism and compassion.

May Her divine presence bless us with *Subuddhi*—the clarity to make wise choices, the courage to stand for what is right, and the kindness to uplift one another. Together, as one community, we can shape a world that honors both tradition and progress, rooted in hope and harmony.

Here's wishing you and your loved ones a safe, joyful, and blessed festive season.

— *Anjali Team*

Editorial Team: Pinki Das, Sayane Shome, Srabasti Mukherjee Gupta, Tinny Bhowmik

# Bengali Prose

## গল্প হলেও সত্যি

অনেক দিন আগের কথা। অপূর্ব তখন সবে ব্যাঙ্গালোরে M.E. পড়তে এসেছে। কলকাতার সবাইকে অপূর্ব বলে এসেছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (IISc) ব্যাঙ্গালোরে সে ভর্তি হবে। তবে যশবন্তপুরে ট্রেন থেকে নেমে দেখলাম যে সবাই IISc তে টাটা ইনস্টিটিউট বলেই জানে। অপূর্ব প্রথমবার কলকাতার বাইরে পড়াশোনা করবে। ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল আর যাদবপুরের গণ্ডি পেরিয়ে এবার IISc। মা বাবা দুজনেই অপূর্বকে ছাড়তে এসেছিলো। আইআইএসসি ক্যাম্পাস দেখে সবাই মুগ্ধ। যেমন সুন্দর স্থাপত্য শিল্প তেমন সুন্দর পরিবেশ। আর ক্যাম্পাসের সবুজ সজীব সতেজ প্রাণবন্ততা অপূর্ব কে প্রথমবারের জন্য বাড়ি ছাড়ার দুঃখ ভুলিয়ে আইআইএসসি কে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে সাহায্য করলো। পড়াশোনা যদি তপস্যা হয়, তবে তার জন্য এমন আদর্শ পরিবেশ ভাবা যায়না - অপূর্ব IISc তে থাকাকালীন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ আব্দুল কালাম নতুন হোস্টেলের উদ্বোধন করেন - অপূর্বের মনে হলো থাকা-খাওয়া র সবকিছুর ব্যবস্থা খুবই ভালো - তাকে খালি পড়াশোনা ভালো করে চালিয়ে যেতে হবে।

নতুন জায়গায় এসে অপূর্ব দুটি সমস্যার সম্মুখীন হল - ব্যাঙ্গালোরের আবহাওয়া কলকাতার থেকে যথেষ্ট ভিন্ন - রাতে ঠান্ডা ভালোই পরে - অপূর্ব প্রায়ই অসুস্থ হতে লাগলো - সর্দি-জ্বর ছাড়া আরেক বিপর্যয় হলো যাদবপুর থেকে IISc-র পড়াশোনা, হোমওয়ার্ক আর পরীক্ষার মানের তফাৎ - অপূর্ব বুঝতে পারলো এখানে স্কুল কলেজের মতো ভালো রেজাল্ট করতে গেলে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে। তবে সময়ের সাথে এই দুই সমস্যা আস্তে আস্তে কমতে লাগলো। অপূর্ব তিন-চারবার সর্দি-জ্বরে ভুগে এই নতুন আবহাওয়ার সাথে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নিলো। আর পড়াশোনার সময়, জীবনে প্রথমবার বুঝতে পারলো - গ্রুপ স্টাডি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ - linear algebra আর random process - এদেরকেও অপূর্ব ক্রমশ বাগ মানিয়ে নিলো। ক্লাস, লাইব্রেরি, বিকেলে একটু আড্ডা আর টেবিল টেনিস খেলা, শুক্রবার মুন্ডি ক্লাব, মাঝে মাঝে মালেশ্বরমের Chungs, আর যশবন্তপুরের Chicken Country - দিনগুলি খারাপ কাটছিলো না।

অপূর্বের খুব ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুর নাম না করলে এই লেখাটি অপূর্ণ রয়ে যায়। শৈবালদা, মৃণাল, বাপ্পাদিত্য, অক্ষ ও শুভ্রাংশু - এক সাথে পড়াশোনা, গল্প, আড্ডা - বিশেষ করে মেসে একসাথে খেতে যাওয়া - বাড়ির বাইরে প্রথমবার থাকা অপূর্বের যা দ্বিধা দ্বন্দ্ব একাকিস্থ - সব যেন বন্ধুত্বের নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় চাপা পড়ে গেলো। এক নতুন পরিবেশে অপূর্ব শৈবালদার মধ্যে যেন এক অভিভাবক কে খুঁজে পেলো - একই সাথে “friend, philosopher ও guide”। কোর্সের পড়াশোনা করার সাথে সাথে শৈবালদা অপূর্বকে বললো যেন IISc এর প্রফেসরদের মধ্যে কার সাথে M.E. এর থিসিস করবে - তা নিয়েও চিন্তাভাবনা করতে।

পাঠক বন্ধু এবার একটু অধৈর্য হয়ে পড়ছে। গল্প কি শুধু পড়াশোনা নিয়ে? তোমরা একটু সবুজ করো। গল্পের মধ্যে অপূর্ব কি বিষয়ে গবেষণা করবে আর শৈবালদা অপূর্বকে কি ব্যাপারে guide করবে - এগুলো গল্পের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ - দেখবে সব কিছুই একই সূত্রে বাঁধা আছে। চারিদিকে এতো ওয়েব সিরিজ - প্রিয় পাঠক বন্ধু - অনেক রহস্য রোমাঞ্চ তো দেখেছো - পূজাবার্ষিকীতে তুমি কি পড়তে চাও? যদি লেখা পড়ে তুমি বিস্মৃত অতীতে গিয়ে পুরোনো স্বপ্নকে স্পর্শ করতে পারো, আমার লেখা সার্থক হবে।

জীবনের এমন সব মুহূর্ত আসে যখন সময় থেমে যায় - যখন দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি মিলিয়ে যায় আর নতুন কিছু আশা / চ্যালেঞ্জ আমাদের উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করে। একদিন মেসে কারি পাতা দেওয়া ম্যাগি নুডলস খেতে খেতে অপূর্ব খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলো - হঠাৎ চোখ তুলে সে চোখ সরতে পারলো না। সামনের টেবিলে আকাশী রঙের সালোয়ার কামিজ - পানপাতার মতো মুখ - হালকা কাজল দেওয়া চোখ - মুখে প্রসাধনের লেশমাত্র নেই - স্থান কাল পাত্র ভুলে অপূর্ব মস্তমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলো - শৈবালদা কাঁধে একটু চাপ দিতে অপূর্বের ঘোরমুক্তি হলো। সে চোখ নামালেও সেই কাজল নয়না হরিণী যেনো মনের মধ্যে রয়ে গেলো। খাবার পর মেসের বাইরে বেরিয়ে মনে হলো - সত্যি পৃথিবী কত সুন্দর - খালি দেখার চোখ থাকা চাই।

তবে IISc তে প্রথম সেমিস্টার এমনই সাংঘাতিক - অপূর্ব তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার তেমন অবসর পাচ্ছিলো না। কোর্সওয়ার্ক, হোমওয়ার্ক আর পরীক্ষা - এদের মিলিত চাপে - সেই আকাশী সালোয়ার যেন কিছুতেই মনে প্রবেশাধিকার পাচ্ছিলো না। প্রথম সেমিস্টারের শেষ পরীক্ষা Random Process। শৈবালদা আর অপূর্ব সারাদিন Lebesgue Measure আর Borel Sigma Field নিয়ে লড়ে গেল। দিনের শেষে শৈবালদা অপূর্বকে বললো - “পরীক্ষা তো প্রায় শেষ, এবার অন্য সাবজেক্টের কি খাবার - অদিতির জন্য তো লাইন পরে গেছে - তুই কোথায়?”



এতো দিনে অপূর্ব কিছু basic তথ্য জেনে গেছে - অদিতি মিত্র, ম্যানেজমেন্ট এ PhD করতে এসেছে। চেন্নাই তে থাকে - প্রবাসী বাঙালি। IISc তে সঙ্গীত সাধনার ও সুযোগ আছে - ক্লাবের নাম Rhythmica। অদিতি Rhythmica তে যোগ দেবার পর রেকর্ড সংখক ছাত্র এবার সেই ক্লাবে নাম লিখিয়েছে। অপূর্ব মনে করে ওকে নিজের মতো করে ভাবতে হবে - গড্ডালিকা প্রবাহে নাম লেখাতে সে অনিচ্ছুক।

অপূর্ব শৈবালদাকে জিজ্ঞাসা করলো “তুমি PhD guide ঠিক করলে?” - শৈবালদা বললো “হ্যাঁ : ভাবছি টি.ভি শ্রীনিবাসের কাছে speech and audio নিয়ে কাজ করবো।” অপূর্ব : “খুব ভালো। আমিও প্রফেসর শ্রীনিবাসের signal compression কোর্স করে খুব আনন্দিত হয়েছি।” শৈবালদা: “চল তাহলে কাল শ্রীনিবাসের সাথে দেখা করি।” কিছু দিনের মধ্যেই দুজনেই স্পিচ এন্ড অডিও ল্যাব (SAG) জয়েন করল। লেখার সময় যেমন আমরা অক্ষর / বর্ণমালা শিখি, speech এর ক্ষেত্রে সেই ইউনিটের নাম Phoneme। অপূর্বের প্রাথমিক কাজ হলো কিছু voice record করা - এবং data-র মধ্যে বৈচিত্র্য খুব গুরুত্বপূর্ণ - ক্লাসমেট দের সবাই পুরুষ - নারী কণ্ঠ কোথায়?

অপূর্ব ভাবলো এই সুযোগ - অদিতিকে মেসে দেখলে এই রেকর্ডিং এর ব্যাপারে বলা যেতে পারে। তবে সব কিছু সহজে পেয়ে গেলে বোধ হয় তার মূল্য কমে যায়। অদিতি কোথায়? শৈবালদা খবর যোগাড় করলো - অদিতি B-non-veg ছেড়ে C মেস জয়েন করেছে। অপূর্ব ও দমবার পাত্র নয় - শৈবালদাই তাকে বলে - “যে কোনো ব্যাপারে পারিস না পারিস, চেষ্টার কমতি রাখবি না - তাহলে পরে আক্ষেপ থাকবে না।” IISc এর ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে email জোগাড় হয়ে গেলো। তখন inter department email করতে গেলো - terminal খুলে Pine mail ব্যবহার করতে হবে - অপূর্ব নিজের আবেগ উত্তেজনা সংবরণ করে অদিতিকে প্রথমবার মেল করলো। শনিবার দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত Adaptive Signal processing এর ক্লাস - সে অদিতিকে বললো - সাড়ে পাঁচটার সময় টাটা লাইব্রেরির সামনে সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করবে। অদিতি জানালো সে আসবে - অপূর্ব SAG ল্যাবে গিয়ে সাউন্ডপ্রুফ রুমে গিয়ে সব জিনিসপত্র চেক করে নিলো।

শনিবার ক্লাস শেষ হবার পর অপূর্ব লাইব্রেরি তে ৫.২০ তে পৌঁছে গেলো - মৃনাল, অঙ্ক, বাপ্পাদিত্য - সবাই সাহস জোগালো - guide শৈবালদা বললো “be confident and be yourself”। ৫.২৫ এ অদিতি চলে এলো - আজকে তুঁতে নীল সালোয়ার পরে - ফর্সা গায়ে গাঢ় নীল খুব মানিয়েছে। SAG ল্যাব এখন ফাঁকা - শনিবার বিকেলে সবাই হয়তো নিজেদের মতো রিল্যাক্স করছে। অপূর্ব ভাবলো অদিতি কে বলা উচিত? ঠিক কি data সংগ্রহ করছে? নারী পুরুষের স্পীচে কি পার্থক্য? bass, timbre, pitch - ভয়েস রেকর্ড করে matlab খুলে common phoneme এর spectrogram প্লট করে দেখিয়ে দিলো কি করছে - শৈবালদা বলেছিলো “অদিতি যেন এই সেশন থেকে কিছু জানতে শিখতে পারে - যেন বোর না হয়।” সব রেকর্ড হবার পর অদিতি একটি শক্ত প্রশ্ন করে বসলো : “অপূর্ব, IISc তে এতো বাঙালি মেয়ে থাকতে তুমি আমাকে ডাকলে কেনো? আমি তো প্রবাসী বাঙালি - কিছু মনে করো না - আমি একটু খোলাখুলি কথা বলি - তুমি মেল করার পর আমি ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে তোমাকে খুঁজে নিলাম - বুঝলাম মেসে তোমাকে দেখেছি।” অপূর্ব : “অদিতি, প্রশ্নটি পরিষ্কার করে করে ভালো করেছো - তোমার সাথে আলাপ হবার ইচ্ছা ছিল - ইদানীং তোমাকে মেসেও দেখি না - আমি ME project করতে speech ল্যাব জয়েন করেছি - ভাবলাম একটা চান্স নি - আর শেষে বলি, প্রবাসী হয়েও তোমার বাংলা উচ্চারণ খুব ভালো আর স্পষ্ট।” অদিতি হাসতে হাসতে : “আমাকে অনেক বকিয়েছো রেকর্ড করার জন্য - একটু চা কফি হলে মন্দ হয়না।” অপূর্ব : “Faculty Club তো কাছেই আছে - চলো যাই।” চিকেন স্যান্ডউইচ আর কফি খাওয়া হলো। অদিতি : “দামটা কিন্তু শেয়ার করতে হবে।” যখন অপূর্ব হোস্টেলে ফিরলো, সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেছে। মৃনাল, অঙ্ক, বাপ্পাদিত্য - সবাই ঘিরে ধরলো। অদিতির গল্প বলে অপূর্ব বললো : “সন্ধ্যাটা আমি ভুলবো না” - আর অদিতির দেওয়া দশ টাকার নোটটা সমস্ত রেখে দিলো। অঙ্ক অপূর্বকে বললো : “সাবাশ” - বলে অপূর্বের ঘরের বাইরে কেন জানি দরজার পাশে পেম্পিল দিয়ে “অদিতি” লিখে দিলো। শনিবার রাতে মেসের খাবারটা খুবই মামুলি হয় - তবে সেদিন কোনো জাদুবশে মামুলি ডিনারটাই অপূর্বের খুব ভালো লাগলো।

এই ঘটনার পর অপূর্ব আর তার বন্ধুরা মেস পরিবর্তন করলো - C mess জয়েন করলো - কিছুদিন বাদে আবার অদিতিকে কয়েকদিন দেখা গেলোনা। তবে এবার তো অপূর্বের কাছে অদিতির ফোন নাম্বার আছে - SMS করলো - খারাপ খবর - অদিতির চিকেন পক্ক হয়েছে - isolation ওয়ার্ডে আছে। অপূর্বের আট বছর বয়সে দিদির থেকে চিকেন পক্ক হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা ক্লাসের পর অপূর্ব isolation ওয়ার্ডে পৌঁছে গেলো - চাঁদের মাটিতে বিভিন্ন গন্ধর থাকলেও তা যেমন তার সৌন্দর্যহানি করতে পারে না, পক্কের দাগ ও অদিতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভাগ বসাতে পারেনি। পূর্ণিমার রাত - অদিতির হাতে অপূর্ব তার হাত রাখলো - অদিতি হাতটি সরিয়ে নিল না - জিজ্ঞাসা করলো “তোমার তো ME দু বছরে হয়ে যাবে - তারপর কি করবে?” অপূর্ব : “ইচ্ছা তো আছে US এ গিয়ে PhD করার।” অদিতি : “আমার তো PhD IISc তেই - বছর পাঁচেক তো লেগে যাবে - আর হ্যাঁ - আমি এদেশেই চাকরি করতে চাই।” অপূর্ব : “তোমার চারিদিকে এতো বন্ধু - আমি এই ভিড়ে হারিয়ে যেতে চাই না।” অদিতি : “অপূর্ব, ভবিষ্যতে যাই হোক - তোমার সরলতা আর সহজ সাবলীলতা বজায় রেখো - তুমি সত্যি আলাদা - ভিড়ের থেকে আলাদা।” অদিতি : “সেইদিন আমার রুমমেট IISc

এর ম্যাগাজিন আমাকে দিলো - তোমার লেখা পড়লাম - একদিন তোমার লেখা তে আমাকে নিও “ । অপূর্ব এক গাল হেসে বললো : “মনে তো আছেই, এবার লেখাতেও আসতে চাও - তথ্যস্তু “ ।

অপূর্ব এই কথা রেখেছিল । Speech segmentation নিয়ে তার ME থিসিসে “Acknowledgement” লেখার সময়, সে অদিতির নাম দিয়েছিলো ।

গল্প তো জমে গেছে - তবে সব গল্প এখনই বলে দিলে তোমরা কি পরে আমার কাছে আর আসবে - বাকি গল্পটা তবে ভবিষ্যতের জন্য রইলো । দিন থেকে মাস , মাস থেকে বছর - দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে গেছে - IISc এখানে স্বমহিমায় জ্বলজ্বল করছে - পুরোনো দিনের অদিতি অপূর্বের জায়গায় নতুন দিনের অদিতি অপূর্বেরা এসেছে - এখন আর মাথা ঘামিয়ে কেউ বোধ হয় প্রেমপত্র লেখে না - চ্যাট জিপিটি তো আছে - দুনিয়া বদলায় , বিজ্ঞান বদলায় , তবে নারী পুরুষের যে সম্পর্ক, এক ঝলক দেখে যে ভালো লাগা, অপেক্ষা, প্রতিজ্ঞা, উত্তেজনা, সাময়িক শিহরণ, মনের কোণায় কোথাও হালকা খুশীর আমেজ - এই আবেগ চিরন্তন - যতদিন মনুষ্য জীবন থাকবে , ততোদিন আমাদের এই অনুভূতি গুলি ঠিক থাকবে । পূজো সবার ভালো কাটুক - সবাই আনন্দ করো , ভালো থেকো ।



*Anindya Sarkar loves to write about all things Bengali and about life and times in the Bay Area. Anindya is a big fan of detective stories and board games and loves to teach maths in his spare time. Anindya works in generative AI in Apple.*



**GET READY TO GLOW!**

### WE OFFER

-  Personalized plan for hair care to keep your hair vibrant and healthy between visits
-  Skin care recommendation suited for you
-  Recommendation based on latest trends



**FOR FREE CONSULTATION!**

**STYLEWITHSUSHME.COM**



## সময়

অনিমেষের আজ খুব হাল্কা লাগছে নিজেকে।  
বন্ধুরা সবাই বলেছিল, “সময় কাটাতে কি করে রে অনিমেষ!”  
কোনও কথার জবাব না দিয়ে সে শুধু একটুখানি মুচকি হেসেছিল।  
সে জানে কীভাবে সময় কাটাতে হয়। তার কাছে সেই রসদ মজুত আছে।

অফিসের বিদায়-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অনেকের অনেক মিথ্যা ভাষণ শুনতে শুনতে তার বেশ হাসি পাচ্ছিল। ভাবছিল, “যিনি মিথ্যা কথা বলছেন, তিনি তো জানেন না যে আমি বুঝতে পারছি। সারাফণ যিনি আমার ক্ষতি করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, তিনি-ই আজ মুখে মুখে আমার প্রশংসা করছেন!”

বাড়ি ফিরে চিত্রকে অফিসের বিদায়-বেলার সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিতে হল। মাঝে মাঝে চিত্রা বলছিল, “আচ্ছা, সুনীলবাবু অরুণদা, তোমার বস আর সন্দীপ কী বলেছিল! আর সেই অচিন্ত্যবাবু যিনি তোমার পেছনে লেগেই থাকতেন, তিনি!” অনিচ্ছাসঙ্গেও অনিমেষকে সবই বলতে হল।

গতকালই ছিল তার চাকরিজীবনের শেষ দিন। দীর্ঘ আটগ্রিশ বছরের বর্ণময় কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। আজ সে বাঁধাধরা জীবনের রোজনাচা থেকে মুক্ত। তবে শেষ দুটো বছর অনিমেষের কাছে ছিল রাতের দুঃস্বপ্নের মতো। চাকরিজীবন একঘেয়ে হলেও কিছুটা বৈচিত্র্য ছিল। অফিসযাত্রার পথে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা—মানুষের সহৃদয়তা, নির্ভুরতা, উদাসীনতা আর অসহিষ্ণুতার সাক্ষী হয়েছে সে। কিন্তু শেষ দুটো বছর!

সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, এমনকি বাড়ির লোকজন থেকেও আলাদা হয়ে মাথা গুঁজে একঘেয়ে কাজ করে গেছে। তখন মনে হতো, যেন কয়েদি ছাড়া কিছু নয়। যদিও আজ সে সংকটকাল কেটে গেছে, তবু সেই ভয়, আতঙ্ক আর সন্দেহের রেখাটা আজও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে অদৃশ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে বলে অনিমেষের মনে হয়। সবাই যেন একেকটা গুটিপোকাকার মতো নিজেদের খোলসের মধ্যে নিরাপদ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

অনিমেষ কিন্তু তেমন পাল্টায়নি, যেমন ছিল তেমনই আছে। অবশ্য আজ একটুখানি আলাদা—সে আজ অবসরপ্রাপ্ত, প্রবীণ নাগরিক।

সকালে ঘুম থেকে উঠে অনিমেষ সোজা চলে এল চিলেকোঠার ঘরে। তখনও কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। চিত্রা বরাবরই একটু দেরি করে ওঠে। সকালে চা বানানোর দায়িত্ব প্রথম থেকেই অনিমেষ নিয়েছে। তার ধারণা, সবার থেকে ভাল চা সে-ই বানাতে পারে।

আজ অবশ্য গ্যাসে চায়ের জল না চাপিয়েই সে উপরে চলে এসেছে। চিলেকোঠার ছোট্ট ঘরটায় একটি খাট, আর একটি বইয়ের আলমারিতে অল্প কিছু বই। অফিসের ছুটির দিনে খাওয়াদাওয়া শেষে অনিমেষ এখানেই সময় কাটাত। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এলেও তার এই অভ্যাসে কোনো ছেদ পড়েনি। প্রথম প্রথম চিত্রা আপত্তি করত—কেন বাড়ির লোকজনের সঙ্গে গল্পগুজব না করে ছুটির দিনেও সে একা কাটায়! কিন্তু চিত্রার কথা কখনও কানে নেয়নি অনিমেষ। ছুটির দিনগুলোতে সে একা থাকতে চাইত চিলেকোঠাতেই।

অনিমেষের একটি অদ্ভুত শখ আছে। কথা সে আজ পর্যন্ত কারও সঙ্গে শেয়ার করেনি। ওর কাছে এটা একান্ত গোপন অভিসার।

এই শখের জন্ম হয়েছিল ক্লাস নাইনে পড়ার সময়। পুরনো ক্যালেন্ডার দিয়ে বইয়ে মলাট দেওয়ার সময় হঠাৎ মাথায় আসে—বড় বড় অফিস ক্যালেন্ডারগুলো জমিয়ে রাখবে। সেই থেকে প্রতি বছর অফিসের ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করে আসছে। আজ সেই শখের বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর।

চিলেকোঠার খাটের নীচে একটি বড় ড্রাস্কের মধ্যে বছর মিলিয়ে সাজানো আছে সব ক্যালেন্ডার। এখন অবসরে সে স্থির করেছে, এই ক্যালেন্ডারগুলো নিয়েই সময় কাটাবে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া শেষে অনিমেষ চিলেকোঠায় এসে ড্রাস্ক খুলে পুরনো দিনের ক্যালেন্ডার বার করল। মেঝেতে বিছিয়ে বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ল। কয়েক দিন ধরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। ভাদ্রমাস হলেও গরম নেই। বাতাসে হালকা ঠান্ডা ভাব। মনে হল, যদি একটা হাল্কা চাদর থাকত! কিন্তু নীচে যাওয়ার আলসেমিতে চাদরের আরাম ছেড়ে দিল। উত্তরের জানলাটা বন্ধ করতেই ঠান্ডা ভাব কেটে গেল। চাদরের অভাব আর টের পেল না।

শুয়ে শুয়ে মনে হল, সে যেন ফিরে গেছে সেই সময়ে। আজ সে বের করেছে ১৯৬৮ থেকে ১৯৮২ সালের ক্যালেন্ডার। মনে পড়ে গেল সেই অস্থির সময়।

প্রায় প্রতিদিনই কয়েকজন তরুণ প্রাণ দিচ্ছে পুলিশের গুলিতে—যারা দিনবদলের স্বপ্ন দেখেছিল। পাড়ায় সন্ধে হলেই বোমাবাজি। চোখের সামনে ভেসে উঠল বন্ধু অভয়ের গুলিবিদ্ধ লাশ। রেললাইনের ধারে পড়েছিল সেই বিভৎস দেহ। একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল অনিমেষ। বহুদিন রাতে ঘুমোতে পারেনি।

না, সেই ভয়ংকর স্মৃতি থেকে মন সরিয়ে নিল দ্রুত। পরক্ষণেই মনে পড়ল শিপার কাছ থেকে পাওয়া প্রথম চিঠির কথা। খুব হাসি পেল—শিপাদের বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে সাইকেল চালিয়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য মনে করে।

নীচ থেকে চিত্রার ডাক এল। চা খেতে।

নীচে নেমে এলে চিত্রা ধমক দিয়ে বলল, “কখন থেকে ডাকছি শুনতে পাওনি? ঘুমোচ্ছিলে নাকি? একেবারে কুস্তকর্ণের ঘুম! নাও, খেয়ে নাও। ঠান্ডা হয়ে গেলে আর গরম করতে পারব না।”

চা প্রায় ঠান্ডাই হয়ে গিয়েছিল। কোনো কথা না বলে অনিমেষ চা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠল। চিত্রা জানিয়ে দিল, আগামীকাল বাজার থেকে কী কী আনতে হবে। অনিমেষ ভাবল, “কাল সকালে জানালেই তো ভাল হত!”

আবার উপরে গিয়ে সে ক্যালেন্ডারগুলো ওড়িয়ে ট্রাঙ্কে রেখে দিল। অথচ মন রয়ে গেল সেই সময়েই—কত মুখ, কত কথা, কত স্মৃতি! মনে পড়ল ছোটবেলায় দুপুরবেলা বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁক শোনা যেত— “দেখো, দেখো, বায়োস্কোপ দেখো! মুম্বাইকা শহর দেখো! আগ্রার তাজমহল, দিল্লির কুতুবমিনার দেখো!”

এক আনা দিয়ে সেই বড় বাস্তুর ভেতর চোখ রেখে ছবি দেখতে বেশ ভাল লাগত অনিমেষের।

ভাবতে লাগল—সময় কি ফিরে আসে?

আসেই তো। না হলে অভয় কী করে এল!

কী করে শিপা সেই ফ্রক পরে তার সামনে এসে দাঁড়াল? আজও মাঝে মাঝে কী করে শিপার চিঠি তার হাতে আসে, সেই পুরনো ঘ্রাণ নিয়ে! অনিমেষ তো সবকিছু হুবহু দেখতে পায় চোখের সামনে।

হঠাৎ সস্বিং ফিরল নীচে কলিংবেলের শব্দে। চিত্রা বোধহয় ঘুমিয়ে আছে।

সদর দরজা খুলে অনিমেষ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। কতক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিল, জানে না।

“আমায় দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি অনিমেষদা?”—কথায় ঘোর কাটল।

মুহূর্তেই ভাবল, সময় কীভাবে সম্বোধন পাল্টে দেয়!

“ভিতরে আসতে বলবে না আপনি?”

“তুমি!”

মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝল, স্বপ্ন নয়—সত্যিই শিপা তার বাড়ির দরজায়।

“কী করে এলে? জানলে কীভাবে যে আমরা এখানে থাকি?”

শিপা অনেক কথা জিজ্ঞেস করল, অনেক হাসলও।

অনিমেষ তাকে নিয়ে ভেতরে এসে চিত্রাকে জাগিয়ে তুলল—

“দেখো কে এসেছে! তোমাকে তো বলেছিলাম, আমার প্রথম প্রেমপত্র যার কাছ থেকে পেয়েছিলাম সেই শিপা! এই সেই শিপা।”

অনিমেষের কথা শুনে শিপা বেশ বিব্রত হল।

চিত্রা বিছানা ছেড়ে উঠে এসে শিপার হাত ধরে বলল, “ভাল আছ তুমি? কী করে আমাদের খুঁজে পেলে? অনিমেষকে এতদিন পরও মনে রেখেছ!”

চিত্রার গলার সুরে নিশ্চিত হল অনিমেষ। বুঝল, আপাতত ঝড়ের সম্ভাবনা নেই। তার মন আরও হাল্কা হয়ে গেল।



ভাবল—সময়ও মাঝে মাঝে আমাদের অতীতকে ফিরিয়ে দেয়, অনেকটা যাদুর মতো।  
সে তখন নিজেকে ভাবল এক অ্যালবার্টস পাখি—ফেলে আসা সময়ের সমুদ্রে ডানা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পাশের বাড়ির টিভিতে ভেসে আসছে এক পুরনো দিনের গান—  
“নিজেরে হারিয়ে খুঁজি, তোমারই নয়ন মাঝে,  
চাহিতে পারি নি কিছু, চাইয়া মরি যে লাগে।”

তিনজনের মুখে একসাথে হাসি, আবছা হাসি খেলে গেল।  
চিত্রা কি সেটা লক্ষ্য করেছিল?

— পার্থসারথি দাস।

## র্যাটেলস্নেক ক্যানিয়নের গর্ভে

ক্যালিফোর্নিয়ার মিঠে গরমের পরশ ছেড়ে ইচ্ছা হল অ্যারিজোনার কিছু অংশ বিশেষ ঘুরতে। মার্কিনী ভূগোল ও আবহাওয়াকে দশ গোল দিয়ে প্ল্যান করা যাতে বন্ধুর বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার সাথে সাথে একটু ভ্রমণ তৃষ্ণার্ত মনকেও যেন শান্ত করা যায়। রথ দেখা আর কলা বেচা - দুইই হবে। সেই সাথে মাথায় আরেক বুদ্ধি খেলল, এই গরমে বেশি ট্যুরিস্ট হবে না, তাই পকেটকে কম কষ্ট দিয়ে সুন্দর করে ঘুরতে পারব। আর বঙ্গ সন্তান হয়ে গরম সহ্য করা তো বাঁ হাতের খেল। তাই প্রায় মধ্য জুনে পৌঁছে গেলাম অ্যারিজোনার পেজ শহরে। পৌঁছানোর প্রথম দুদিনে বিশ্ববন্দিত গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঁক আর সেই সাথে ক্যানিয়ন এক্স, যা একটি স্লট ক্যানিয়ন, সেগুলো দেখে নিয়েছিলাম। আজ সেগুলির বৃত্তান্তে যাবো না। বরং বলব, অন্য আরেকটি স্লট ক্যানিয়ন ভ্রমণের গল্প।

ক্যানিয়নের বাংলা আভিধানিক অর্থ হল, গিরিখাত। তবে স্লট ক্যানিয়নের সাথে এই ক্যানিয়নের বিশেষ পার্থক্য আছে। স্যান্ডস্টোন জাতীয় পাথরের ফাটলের ভেতর দিয়ে বৃষ্টির জল ঢুকে গিয়ে আকস্মিক বন্যা (ক্ল্যাশ ক্লাড) সৃষ্টি করে। সেই বন্যার জল সরে গেলে, আর হাওয়ার গতিপ্রবাহ ভিত্তি করে বহু বছরের তপস্যায় এই স্লট ক্যানিয়নের রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, যা আজ আমরা ক্যামেরা বন্দী করতে ছুটে আসি দূর দূরান্ত থেকে। ফিরে আসি আমাদের বেড়ানোর গল্পে। প্রচণ্ড দাম আর ভিড় এড়াতে বিখ্যাত অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়নের মায়া ত্যাগ করেছিলাম। তাই আমাদের প্ল্যান ছিল অন্যন্য, সামান্য অচেচা কিছু ক্যানিয়ন এ যাত্রায় দেখে নেব। তাই আমাদের এই ভ্রমণের তৃতীয় দিনে ভরা জ্যেষ্ঠের এক সকালে বেরিয়ে পরেছিলাম অখ্যাত মাউন্টেন শীপ স্লট ক্যানিয়ন দেখতে। আমাদের হোটেল থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক রাস্তা, মিনিট দশেকের মধ্যে ন্যাড়া পাহাড়ি জমি আর লাল কাঁকুড়ে রাস্তাতে ঈশ্বর ঝাঁকুনি খেতে খেতে পৌঁছলাম ক্যানিয়ন স্ট্রিক ট্যুরের ঠিকানা। গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম, এই ভূ প্রান্তরে দৃশ্যমান মানুষ বলতে আমরা দুজন কর্তা গিল্লী, সামনে ট্যুর কোম্পানির সাইনবোর্ড ঝুলছে আর একটু পেছনে একটা ছোট ঘুমুটি। আমরা জানতাম, এটা মার্কিন দেশের নাবাহো জাতি-উপজাতির বাসস্থান, কিন্তু ট্যুর কোম্পানির অফিসের সামনেও প্রায় জনমানবশূন্য হবে ভাবিনি। বলে রাখি, তখন বাজে সকাল সাড়ে দশটা। অন্য ট্যুরিস্টও চোখে পড়ল না। তারপর ঐ ছোট টিনের ঘুমুটির ভেতরের কাউন্টারে চেক ইন পর্ব সাজ হতে আমাদের নাবাহো ট্যুর গাইড বেরিয়ে এলো। বছর চব্বিশ পঁচিশের ছেলেটি পরিচয় দিল, তার নাম কেভিন আর আজকের এই টাইম স্লটে আমরা দুজনেই কেবল তাদের ট্যুরিস্ট। কথাটি শোনামাত্র আমি মনে মনে নেচে উঠলাম, আহা, কত ভাল করে ছবি তোলা যাবে ...আর প্রাইভেট ট্যুরের এদেশে যা দাম, তা কপাল গুণে হয়ে গেল, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার কর্তার মনে মনে ভয়...অতি সাবধানী মানুষদের যা হয়!

আমরা দুজনে একটি ট্রাকের মত গাড়িতে উঠে বসলাম, আমার নিজের গ্রামে এই গাড়িগুলোকে ট্রেকার বলা হয়। সেরকমই এক গাড়ি, তাতে দুটো দিকে দুটো লম্বালম্বি সীট, আর ধরে রাখার জন্য দুটো হাতল। আমাদের গাইড কেভিন তখন ড্রাইভারের ভূমিকা নিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাল কাঁকুড়ে মাটি ছেড়ে আমাদের গাড়ি চলে এলো বালির রাস্তায়। সেই বালিতে গাড়ির ঝাঁকুনি প্রচণ্ড বেড়ে গেল। মাথার ওপরের হাতলটা ধরে কোনো রকমে সীটের ওপর এক প্রকার স্টেটে আছি। গাড়ির চাকার উড়ন্ত বালি খানিক গাড়ির ভেতরে এসে আমাদের মুখে চোখে লেগে যাচ্ছে। মরুভূমির আরো গভীরে প্রবেশ করে চলেছি, ইতিউতি ঝোপঝাড় অনেক, তার মাঝেই লাল, সাদা, কালো গরুর পাল সেই ঝোপ খেয়ে চলেছে। দেখে মায়া হল, আমাদের গ্রামের গরুগুলো কত সুন্দর তাজা ঘাস খায় সাথে খড় বিচালি, আর এদের কপালে শুধু এই মরুদেশের শুকনো ঘাস!

প্রায় মাইল দুই-তিন এরকম ভাবেই চলেছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের গাড়ি থেমে গেল। ক্রমাগত চাকাগুলো ঘুরছে, সাঁই সাঁই করে বালি ওড়াচ্ছে, তবু গাড়ি আর নড়ছে না। যে জায়গায় আছে, সেই জায়গাতেই আটকে, আর সেই বালির ধুলো আমাদের মুখে চোখে ক্রমাগত ছিটে আসছে। বেশ অনেক ক্ষণ চুপ করে প্রকৃতি দেখছি আর মনে মনে ভাবছি, বরমশাইয়ের মনের ভয়টাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে গেল! দৃশ্যপট থেকে ঘুরে তাকাতো দেখি, মহাশয় আমার দিকে মিটিমিটি হাসছেন, ভাবখানা এমন, দেখলে তো, কি বলেছিলাম...আমাকে বিরস বদনে বসে থাকতে দেখে তিনি আমাদের গাইড কেভিনকে জিজ্ঞাসা করে ফেললেন, ব্যাপার কী? কেভিন বলল, কয়েক দিন ধরেই রাতে ঝড় হচ্ছে, রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। বুঝলাম, এখানে আসার পর থেকে রোজ সন্ধ্যাতে যে আকাশের বিদ্যুতের চমক দেখছি, সাথে ঠাণ্ডা হাওয়া - এ সেই সবেই ফল। কেভিন আরও বলল, সে কোম্পানিতে ফোন করে আরেকটি গাড়ি আনতে বলেছে। তার কথায় আমাদের উৎকণ্ঠা খানিক প্রশমিত হল। ধূ ধূ মরুপ্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আর গরুদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা দেখতে দেখতে অপেক্ষা করতে থাকলাম কখন আমাদের উদ্ধারকারী গাড়ি আসবে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর একটি কালো সুমো গাড়ি এলো। গাড়ির চালক সেই কাউন্টারে বসা ভদ্রলোকটি। তিনি এসে বললেন, আমাদের কপালে আর মাউন্টেন শীপ ক্যানিয়ন দেখার সৌভাগ্য নেই। তবে ওনারা অন্য রাস্তা দিয়ে আমাদের অন্য আরেকটি ক্যানিয়ন দেখাতে নিয়ে যাবেন। র্যাটেলস্নেক ক্যানিয়ন! কথাটা শুনে আমি শুকিয়ে গেলাম। আসলে সাপের ভয় কার না লাগে! মানে, আমার মত সাধারণ মানুষের লাগে। আর এই প্রচণ্ড গরমের দাবদাহে এই প্রাণীগুলো একটু ঠাণ্ডার আশায় ক্যানিয়নেই বিশ্রাম নেয়। অন্যের সাজানো আশ্রয়স্থলে অযাচিত হয়ে ঢুকে যাওয়াটা আমার ঘোর অপছন্দে। টিকিট বুক করার সময়েই আমি এই কোম্পানিতে ফোন

করে এই র‍্যাটেলস্কে ক্যানিয়নের নামকরণের সার্থকতা জানতে চেয়েছিলাম। সেই তথ্যের সাথে ওরা বলেছিল, ওদের গাইডরা জংলি প্রাণী তাড়াতে সিদ্ধহস্ত, ওরা নাকি সবসময় সাথে একটা ছড়ি মত জিনিস রাখে।

তবে নিশ্চিত হতে পারিনি। তাই ভেবে চিন্তে আমি তখন র‍্যাটেলস্কে ক্যানিয়নের ট্যুরটা আর বুক করিনি। কিন্তু কপালে থাকলে যা হয়! নিজের হাতের আংটিটা কচলাতে কচলাতে ফেলুদার &#39;বাদশাহি আংটি' গল্পটা মনে পড়ে গেল। সেখানেই প্রথম র‍্যাটেলস্কেকের সম্বন্ধে রোমহর্ষক বিবরণ পড়েছিলাম ... তাহলে কি শেষ পর্যন্ত সাপের পেটেই যাবো?... ইষ্টনাম জপতে জপতে সুমো গাড়িতে উঠে ফিরে এলাম অফিসের সামনে। আবার অন্য একটি তিন-দিক-খোলা ট্রেকার মার্কা গাড়িতে চেপে আমরা চললাম আমাদের নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। প্রবল ঝাঁকুনিতে ক্রমাগত দুলতে দুলতে অ্যারিজোনার বিভিন্ন ভূমিরূপ - সমতলভূমির বালি, তার মাঝে মাঝে জেগে উঠেছে মালভূমির মত পাহাড় - দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম গুহামুখের একদম সামনে। আমাদের সামনে আরও একটি পাঁচ-ছ'জনের ট্যুরিস্ট দল গুহাতে প্রবেশ করল। এই নির্জন দেশে তাহলে আরও কিছু মানুষ এসেছে, ভেবে মনটা খানিক শান্ত হল। গাড়ি থেকে নেমে খানিক বালির স্লুপ হাঁচর পাঁচর করে ডিঙ্গিয়ে উঠে এলাম গুহার প্রবেশমুখের সামনে। সেখান থেকে স্টিলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে। কেভিন আমার জলের বোতলটা নিজের ব্যাগে নিয়ে পথ দেখাতে দেখাতে এগিয়ে চলল। আসলে ট্যুরিস্টদের সাথে জলের বোতল, টুপি, রোদ চশমা আর মোবাইল ফোন ছাড়া কিছু নিয়ে আসার নিষেধাজ্ঞা আছে। এমনকি ভিডিও করাও নিষিদ্ধ। ইউটিউবে তাই বিশেষ করে এই কম পরিচিত ক্যানিয়নগুলোর সাম্প্রতিক সময়ের কোনও ভাল ভিডিও খুঁজে পাইনি। যা শুনেছিলাম এই কোম্পানির লোকজনের থেকে যে, এই ভিডিও করতে গিয়ে দুই ট্যুরিস্টের মধ্যে বাগবিতণ্ডা গিয়ে পৌঁছেছিল মামলা মোকদ্দমায়। তাতে জড়িয়ে গিয়েছিল এই নাবাহো জাতির মানুষজনও। অগত্যা শুধু ছবি তোলা ছাড়া আর কিছু করা যাবে না।

সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠেই নামতে হল একটি গর্ত মত জায়গায়। একজনের বেশি মানুষ একবারে যেতে পারবে না। বুঝতে পারলাম গুহা মুখ খুবই সরু। আবারও আরেকটি সিঁড়ি চড়ে উঠতে হবে ওপরের দিকে। লাল-খয়েরীরা পাথুরে দেওয়ালগুলো এত ঘেঁষে যে খানিক নিজের শরীরকে হেলিয়ে দুলিয়ে নিতে হবে দেওয়ালের বাঁক অনুযায়ী। ঠাণ্ডা দেওয়াল তাই বাইরের রোদে প্রকোপ কম। তা সত্ত্বেও ঘন ঘন জল খাচ্ছিলাম। পাথরের দেওয়ালগুলো ভাল করে দেখলে বোঝা যায়, সেই পাথরগুলোর ওপর সমান্তরালভাবে অনেক সরু সরু রেখা চলে গেছে - এগুলো সুদীর্ঘ বছর ধরে বায়ুর আঁচড়। সেই সাথে আছে ক্যালসাইটের নিখুঁত সাদা শিরার মত রেখাগুলো। আমাদের পায়ের নিচে লাল বালির মোটা আস্তরণ। এক দুঃসাহসিক অভিযানের স্পৃহা নিয়ে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে মাথার খেয়াল ও রাখতে হচ্ছিল। এক একজায়গায় সামনে নিচু, এবড়ো খেবড়ো। সামনে ঝুঁকে মাথা বাঁচিয়ে হাঁটা ছাড়া গটি নেই। আবার কোথাও কোথাও ক্যানিয়নের মাথা একদম ফাঁকা, আমরা মাথা তুললেই দেখতে পাচ্ছিলাম বিশাল নীল আকাশে খেলে বেড়াচ্ছে সাদা তুলোর মত মেঘরাশি। ক্যানিয়নের যত গভীরে যাচ্ছি, তত মাথার ওপরের আকাশ কমতে শুরু হয়েছে। কখনো আবার মাথার ওপরে আকাশের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। ক্যানিয়নের সেই ফাঁকা অংশ দিয়ে সূর্যদেবের আলো ঠিকরে ভেতরে ঢুকছে। সূর্যের আলো এই লাল-খয়েরী স্যান্ডস্টোনের দেওয়ালে হাল্কা নীলচে-বেগুনি আভার সৃষ্টি করেছে আবার কোনো পাথর হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল সোনালি হলুদ কিংবা আগুনের মত কমলা রঙের। কোনো কোনো জায়গায় সূর্যরশ্মি যেন আলোর পিলারের মত সৃষ্টিও করেছে। কিন্তু রাস্তা সেই সাপের মত আঁকাবাঁকা লহমাতেই চলেছে, যত ভেতরে যাচ্ছি, সেই ছন্দ ততোধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কেভিন মাঝে মাঝেই আমাদের দাঁড় করিয়ে আমাদের ছবি তুলে দিচ্ছিল। আমরাও নিজেদের মত প্রচুর ছবি-নিজস্বী তুলে নিচ্ছিলাম পাথরের গায়ে সামান্য হেলান দিয়ে, কিংবা আলতো স্পর্শ করে। প্রকৃতির এই ভাস্কর্যের রূপ নিজের চোখের মণি ছাড়া আর কোনো লেন্সই বোধ করি ভালভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। বেলেপাথরের এই স্তরগুলোর ওপর হাত রেখে তার বয়সের অনুমান করার চেষ্টা করি। পায়ের নিচের বালির আস্তরণ দেখিয়ে কেভিন বলে একদিন প্রকৃতির খামখেয়ালির চাপে তাপে এগুলোও পাথরের আরেকটি স্তরে পরিণত হবে।



এই সংকীর্ণ পাথুরে রাস্তায় একজন করে হাঁটলেও পুরো সোজা হেঁটে যাওয়া যায় না। রাস্তা শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলেই একটি করে স্টিলের সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে যেতে হয় আরও ওপরে। হাঁটতে হাঁটতেই কেভিন ওর গাইড হওয়ার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে ভাগ করে নিচ্ছিল। কখনও শেখাচ্ছিল নাবাহো ভাষার কিছু কথা, যেমন দাদু বা ঠাকুমাকে ওরা কি বলে ডাকে। কিংবা কোনখানে কোন পশুকে দেখেছে। যেমন ওর ফোন থেকে একটা একটা মাউন্টেন লায়নের (পাহাড়ি সিংহ) ছবি দেখালো। সে এই ক্যানিয়নের ভেতরে ডেরা বেঁধেছিল। মনে উদ্বেগ জন্মাল, পশুরাজের সাথে আবার আমাদের মোলাকাত না হয়ে যায়! সকাল থেকেই যখন আমাদের ভাগ্য আগভূম বাগভূম খেলছে ...

কেভিনের সাথে কথোপকথনের মধ্যে থেকে বুঝতে পারছিলাম, ও নিজের জাতি-উপজাতি, ওদের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে কত গভীর ভাবে সম্মান করে, জানার চেষ্টা করে। ক্যানিয়নের মধ্যে ওর পিঠের ব্যাগ থেকে ওর বাঁশিটা বার করে দেখাল। দেখে বুঝলাম, এয়ার ইন্সট্রুমেন্ট হলেও বাঁশি না। এটা দুই নালি বিশিষ্ট। একটি কাঠের মধ্যেই দুটি নালি দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। তার ওপর কালো নকশা করা। বাঁশির মতই হাওয়ার যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওপর দিকে বেশ কয়েকটি গোল গোল ফুটো আছে। আমাদের অনুরোধে ও আমাদের ঐ দোঃ39;নালি বাঁশি বাজিয়ে শোনালো। সেই গানের ধ্বনির অনুরণন হচ্ছিল ক্যানিয়নের বিভিন্ন প্রান্তে। গানের পর দেখালো ওর একটা ফোল্ডিং ছড়ি, যা দিয়ে নিজেদের সুরক্ষার জন্য বন্য প্রাণী তাড়ানো যায়। সেই সাথেই কেভিন বলল, ওরা প্রকৃতির পূজারী। ওর জামার হাতায় আঁকা নাবাহো চিহ্ন দেখিয়ে চিহ্নের অর্থ বুঝিয়ে দিল। গোল করে আছে পঞ্চাশটি তীরের কালো ফলা যা বলে পঞ্চাশটি রাজ্য থেকে সুরক্ষার আশ্বাস, তার ভেতরে লাল, হলুদ আর নীল রঙ্গের তিনটে মুখ খোলা বৃত্ত যা দিয়ে বোঝানো হয় রামধনু আর খোলা মুখ দিয়ে নাবাহো জাতির সার্বভৌমত্ব। তারপর আছে সূর্য। আর তার নিচে চারটি রঙ্গের - সাদা, নীল, হলুদ ও কালো রঙ্গের চারটে পাহাড়ের ছবি। এই পাহাড়গুলির মধ্যে রয়েছে ঘোড়া, গরু ও ভেড়ার ছবি - এই পশুগুলোকে এরা প্রতিপালন করে থাকে। আর পাহাড়গুলোকে বেটন করে আছে এক জোড়া ভুড়ার গাছ যা সমৃদ্ধির বাহক। সেই সাথে দেখায়, ওর পরিহিত গহনা - গলার হার ও হাতের ব্রেসলেট, যা ওরা মনে করে ওদের সুরক্ষা প্রদান করে।

প্রায় মাইল খানেক সর্পিল এই ক্যানিয়নের প্রায় শেষ ভাগে আমরা পেলাম একটি সুন্দর আর্চ। হাওয়া-বৃষ্টির দাপটে পাথরটা এমন ভাবে কয়েক লক্ষ বছর ধরে ক্ষয়েছে যে এখন আমরা দেখি শুধু এই শীর্ণ পাথরের এক ফালি যা দুটো মস্ত পাথরের মেলবন্ধন করেছে। এই আর্চটি অতিক্রম করতে আমরা প্রায় পাথরের চাঁইয়ের ওপর খানিক শুয়ে শুয়ে পার হতে হল। কেভিন বলল, এই আর্চটির ছবি ওর কোম্পানির লোগো হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সত্যি লোগো বানানোর মতই এক ও অদ্বিতীয়। এই রকম আর্চ আমরা ঐ জায়গায় আরেকটি দেখিনি; অনেক পরে দেখেছিলাম নেভাডা রাজ্যের ভ্যালি অফ ফায়ার স্টেট পার্কের আর্চ রক্ যার সাথে এই আর্চের সাদৃশ্য পাই।

আঁকাবাঁকা এই ক্যানিয়নের শেষ হচ্ছে প্রায় আট দশ ধাপের বড় স্টিলের সিঁড়ি দিয়ে। মাঝের প্রত্যেকটি সিঁড়ি দিয়ে উঠে উঠে আমরা উচ্চতায় উঠে যাচ্ছিলাম, আর শেষটায় অনেক গুলো সিঁড়ি উঠে একদম ক্যানিয়নের গর্ভ থেকে বেরিয়ে এলাম মাথায়। উঠে দেখলাম, ক্যানিয়নের বাইরের পাথরগুলো যেন স্যান্ডউইচের বিভিন্ন স্তরের মত, একটার পর আরেকটা। শুকনো ঝোপ ঝাড় গজিয়েছে এদিক ওদিক। বাইরের পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছিল না, যে এই পাথরের ভেতরেই রয়েছে এত সুন্দর সর্পিল সুরঙ্গ। কেভিন আমার কথা শুনে জবাব দেয়, এই সুরঙ্গ গুলো তাই বহু বছর অনাবিষ্কৃত ছিল। নাবাহো মানুষেরা এগুলো পশু চড়াতে চড়াতে আবিষ্কার করে। তারপর এগুলো নাবাহোদের কাছে হয়ে ওঠে বিদেশী আক্রমণকারী শত্রুদের থেকে আত্মগোপন করার আস্তানা। কালক্রমে, আজ এই স্লট ক্যানিয়নগুলো হল পর্যটনের জনপ্রিয় স্থান। পর্যটন ও মানুষের জন্য বিস্তারিত অগ্রগতির সহায়তায় এই স্লট ক্যানিয়নের মধ্যে বসানো হয়েছে অত্যাধুনিক ক্ল্যাশ ক্লাড সেন্সর যা থেকে বন্যার পূর্বাভাস পাওয়া যাবে অনেক আগেই।

ফেরার পথ নিম্নগামী। কাঁটাঝোপ, ক্যাকটাস আরও নানা শুকনো ঘাসজাতীয় গাছের পাশ কাটিয়ে নামছিলাম। ধান ঝেড়ে না-কাটা-শুকনো ধান গাছের মত একটা গাছ দেখিয়ে কেভিন জানালো, এরকম গাছ দিয়ে ওরা সাবান হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আর এই ক্যাকটাস থেকে সুমিষ্ট জেলি হয়ে থাকে। এবড়ো খেবড়ো পাথুরে রাস্তায় হেঁটে তারপর শেষ প্রান্তে ঝুরো বালির স্তর পেরিয়ে আমরা আবার ট্যুর কোম্পানির ট্রেকার গাড়িতে চেপে পরলাম। ভেবেছিলাম, আমাদের আজকের সাফারি সঙ্গ হল।

কিন্তু কেভিন আমাদের নিয়ে গেল আউল ক্যানিয়নে, এখানে ক্যানিয়নের ফাঁক ফোকরে অনেক সময় প্যাঁচা বাসা বাঁধে। তবে আউল ক্যানিয়নের মধ্যের রাস্তা সুবিস্তৃত ও মসৃণ, পাশে বিশাল বড় লাল স্যান্ডস্টোন গম্বুজের মত জা উঠে গেছে কয়েক মানুষ সমান উচ্চতায়। কিছু গম্বুজকে দেখে আবার প্যাঁচার অবয়ব বলে মনে হবে। তবে মন তখনও পরে ছিল র্যাটেলস্নেক ক্যানিয়নেই। কেভিন শিস দিতে দিতে চলেছে, যাতে ওর শিস শুনে কোনো পাখি বেরিয়ে আসে। ফিরতি পথে একটি ফোকর থেকে মাথা বার করলেন মা লক্ষ্মীর বাহন। একেবারে শেষ পাতে কেভিন এক মুঠো লাল বালি আর জলের বোতল থেকে সামান্য জল নিয়ে একেবারে স্কুলের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উৎসুক ছাত্রের মত আমাদের দেখালো বৃষ্টির জল আর বাতাসজনিত ঝয়ের ফলে আর টেক্টনিক প্লেটগুলোর নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতে কিভাবে তৈরি হয় এই স্লট ক্যানিয়নগুলো। কেভিনের গুগল দেখে আমরা দুজনেই তাকে সমীহ করছিলাম। আমার স্বামী কৌতূহলী হয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করেন, এত বৈজ্ঞানিক তথ্য কিভাবে সে জেনেছে। কেভিন জানায়, এখানে ট্যুরিস্ট কোম্পানিগুলো গাইডদের প্রশিক্ষণের জন্য ভূতত্ত্ববিদদের নিয়ে আসে, সেই লেকচারগুলো থেকে সে রীতিমত খাতায় নোটস নিয়ে রাখে। তাছাড়াও সরকারী স্কুলেও ওদের মাতৃভাষা পঠনপাঠনেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে ওদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন তাদের শিকড়কে সব সময় মনে রাখে।

অনন্যসুন্দর প্রকৃতির এক মনমুগ্ধকর ছবি মনে এঁকে আমাদের স্লট ক্যানিয়নের ভ্রমণ সাজ হল। ফিরে এসেছিলাম আবার পেজ শহরে। দক্ষিণাসহ অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম কেভিনের থেকে। ধন্য তার অধ্যবসায় আর মাতৃভূমির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা। মনে মনে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম মা মনসাকেও, বাংলার এই লৌকিক দেবী বঙ্গদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও ভাগিস্ সেদিন তাঁর ছানাদের নিজের কাছেই রেখেছিলেন!



মরুভূমিতে গরুর পাল।

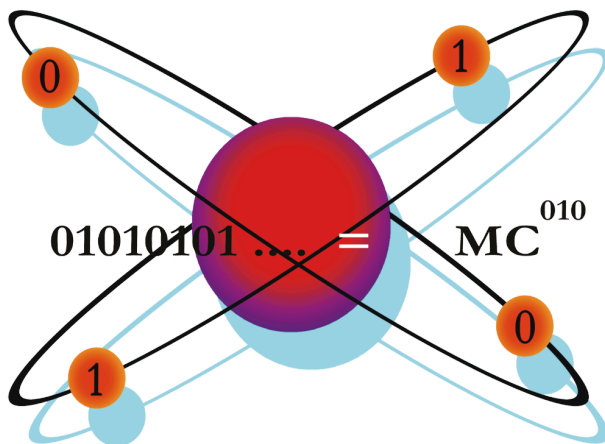


মাউন্টেন শীপ ক্যানিয়ন যাওয়ার পথে মরুভূমির মাঝে আমাদের একেজো ট্যুরিস্ট গাড়ি। বালিতে চাকা আটকে গেছে।



র্যাটেলস্নেক ক্যানিয়নের সেই অনন্য আর্চ।

মৈত্রেয়ী ঘোষ বর্তমানে রসায়ন নিয়ে গবেষণা করেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবসরে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতে ভালবাসেন।



**NUCLEODYNE  
SYSTEMS**

## দিল্লি বিড়লা মন্দির

উপারম্ভ : ১৮ই মার্চ ১৯৩৯ । দিন শনিবার । চৈত্র মাসের এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিন । সূর্যের তাপ অগ্রাহ্য করে, বেলা দুটোর পর থেকেই উৎসাহী জনতার ভীড়ে থিকথিক চারিদিক । মণ্ডপে ঘেরা মন্দিরের বিশাল চত্বর উপছে, মানুষের আশা উদ্দীপনার ঢল নেমে গেছে মসৃণ পিচ ঢালা চওড়া রিডিং রোড অবধি । কৌতূহলী জনতার অবরোধের দরুন দুপাশের যান চলাচল ব্যাহত । যতদূর চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ, ঢেউয়ের মত উঠছে-নামছে । স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় এই প্রথম এক শান্ত, সুস্থ জনতার ভিড়, এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থাকার আগ্রহে আরামদায়ক ও দৃষ্টিগোচর জায়গার খোঁজে ঘন ঘন নিজ অবস্থান পাল্টাচ্ছে । আবাল বৃদ্ধ বনিতা, অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে কখন এক ঝলক দেখা পাবে সেই মহান আত্মার যার এক ডাকে তারা জেল তো কোন ছাড়, প্রাণ দিতেও প্রস্তুত । প্রায় পঞ্চাশ হাজারের ও বেশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ভুলে, একে অপরকে ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার ছলে অবরুদ্ধ করে রেখেছে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ । শুধু একটিবার, তাঁকে চোখের দেখা ও ছুঁয়ে দেখার উন্মাদনায় আক্রান্ত সবাই । গত কয়েকদিন যাবৎ দিল্লিতেই তাঁর অস্থায়ী প্রবাস । দেশ কল্যাণে নিয়োজিত প্রাণ । অতি ব্যস্ততার দরুন তাঁর কাছে দুদণ্ড সময় পাওয়াই দুষ্কর ।

ইতিহাস সাক্ষী, স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে, “রাজকীয় শাসনতন্ত্রের” (প্রিন্সলি এস্টেট) অবসান ও তার পরিবর্তে দায়িত্বপূর্ণ এবং দায়বদ্ধ সরকারের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তা ‘স্বরাজ আন্দোলন’ এরই এক অভিন্ন অংশ হিসেবে পরিগণিত । রাজকোট রাজকীয় শাসন ব্যবস্থার, সক্রিয় বিরুদ্ধাচরণ ও সংশোধনের আগ্রহের দরুনই তাঁর অশক্ত ও জরাগ্রস্ত স্ত্রীর রাজকোট জেলে যাওয়া । এক প্রেসবার্তায় ঘোষণার উপান্তে, ৩রা মার্চ ১৯৩৯ থেকে, তিনি নিজে, আমরণ অনশন আরম্ভ করেন । নাতিদীর্ঘ অনশন ভেঙে দিলেন ৭ই মার্চ । তৎকালীন ভাইসরয় মারকুইস লিনলিথগোর অনুরোধে । পরবর্তী আলোচনার জন্য ভাইসরয়ের আমন্ত্রণে বিশেষ বৈঠক ১৫ ও ১৬ই মার্চ দিল্লিতেই । তাই মাত্র কয়েকদিনের জন্য দিল্লিতে বাস । অপ্রত্যাশিত সুযোগ । তাঁর অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি ওই নবনির্মিত মন্দির কর্তৃপক্ষ ।

দীর্ঘ বিলম্বের অবসান ঘটিয়ে ঠিক বিকেল চারটে নাগাদ তিনি সপার্ষদ মন্দিরে এসে পৌঁছিলেন । অধৈর্য ভিড়ের আধিক্যে এবং অপেক্ষারত দর্শনার্থীদের অতি উৎসাহে, তিনি বেশ কিছুক্ষণ মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতেই পারলেন না । ছুঁড়ে দেওয়া শ্রদ্ধার ফুল ও মালা লুফে নিয়ে তিনি স্বহাস্যে ফিরিয়ে দিলেন ভালবাসায় উদ্বেলিত জনতার দিকেই । স্বভাবসিদ্ধ হাত জোড় অবস্থায়, স্নিত হাস্যে, ভিড় ঠেলে নোরকমে এগিয়ে যেতে লাগলেন মঞ্চের দিকে – যেখানে অপেক্ষা করছেন পূজারি পন্ডিত হরদত্ত শাস্ত্রীজি । বিধিসম্মত পূজা অর্চনা, যন্তু ও নানা আচার অনুষ্ঠানের পর সেখান থেকেই সমাধা হল উদ্ঘাটন পর্ব । তাঁর করকমল দ্বারা বহু আকাঙ্ক্ষিত এই বিশাল মন্দির প্রাঙ্গণের দ্বার উন্মোচনের পর নবনির্মিত “লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির” (দিল্লি বিড়লা মন্দির) এবং সংলগ্ন পরিসরে নির্মিত ‘বৌদ্ধ বিহার’ উৎসর্গিত হল জনসাধারণের নামে । নব নির্মিত মন্দিরটি, জাত-পাতের উর্ধে সর্বস্তরের স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে, এবং সকল সাধারণ মানুষের জন্য সেই দিন থেকে হল উন্মুক্ত ও অবারিত দ্বার । উদ্ঘাটন সমারোহে বেশ কিছুক্ষণ সময় দেওয়ার পর তিনি পুষ্পগন্ধে সুবাসিত, আশ্রপত্রে সুসজ্জিত এবং মর্মর প্রস্তর আবৃত ও ভূষিত, সেই রমণীয় মন্দির প্রাঙ্গণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘুরে দেখলেন । প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আশীর্বাদ করলেন মন্দির নির্মাণাগণ সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত উপস্থিত শিল্পী, কারিগর ও কলাকুশলীদের । ইতিমধ্যে উৎসাহী জনতা ‘গান্ধীজি কি জয়’ জন ঘোষে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছে । পরের দিন প্রত্যেকটি সংবাদ পত্রে গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হয় গান্ধীজির বাণী সহ শুভ ‘উদ্বোধন সমারোহের’ প্রতিবেদন ।

প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও কারুশিল্প প্রদর্শনী: স্বদেশি আন্দোলন, যেমন ভারতের সুপ্ত গণচেতনাকে জাগ্রত করে তেমনই এই আন্দোলন, তৎকালীন জাতীয় রাজনীতি, ধর্ম, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যেও, নবজাগরণের এক অবিস্মরণীয় প্রতীক হয়ে ওঠে । স্বদেশি আন্দোলন ভারতীয় সমাজ জীবনকে পুনঃ জাগরিত করেছে, নবনির্মাণ সহ নানা সৃজনাত্মক কার্যেও প্রেরিত করেছে । ঠিক এই নবজাগরণের সময়, বাংলার এক খ্যাত নামা স্থাপত্য কলা বিশারদ শ্রী শ্রীশ চন্দ্র চ্যাটার্জি ভারতীয় স্থাপত্যকলার পুনরুদ্ধার ও সংস্কার হেতু স্থাপত্য বিদ্যার এক নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে তার প্রচার ও প্রসারের জন্য, সারা ভারত পরিভ্রমণ করতঃসাধারণের মাঝে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা, বাস্তুশিল্প ও শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে এক সম্যক ধারণা গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন । ভারত ভ্রমণ শেষে, অধুনা বিলুপ্ত কলকাতার সিন্ডিকেট হলে (১৯৩৪)

-“ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচারাল এক্সিবিশন” নামে এক বিশাল চারুকলা প্রদর্শনী’র আয়োজন করেন । উদ্দেশ্য - ‘ভারতীয় স্থাপত্য বিদ্যা’র বিদ্যালয়’ গড়ে তোলার প্রাক্কালে ভারতীয় জনমানসে সচেতনতা প্রতিষ্ঠা করা । প্রদর্শনী’র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তদানীং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় । খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় খ্রিষ্টাব্দ থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের আমল অবধি প্রায় পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যময় ইতিহাস- চিত্রাঙ্কন, পরিকল্পনা সহ রেখাচিত্রের নকশা, মানচিত্র ও আলোকচিত্র, কারুশিল্প ও ভাস্কর্য দ্বারা সুনিপুণ ভাবে তিন বিভাগে বিভক্ত করে প্রদর্শিত হয়, যথাক্রমে- যুগ, শৈলী ও আঞ্চলিকতার মাধ্যমে মোট সাতটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভাজিত যথা :



১) প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ভারত, ২) বৃহত্তর ভারত, ৩) প্রাক ও পরবর্তী-গুপ্ত যুগ, ৪) মধ্যযুগীয় ভারত ৫) মুঘল সাম্রাজ্যে ভারত, ৬) পূর্বকালীন বাংলা এবং ৭) আধুনিক ভারত ।

শ্রেণিবদ্ধ প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য, পরিদর্শক ও অভ্যাগতদের আকর্ষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । সেই সময়ের “দি ক্যালকাটা স্মুনিসিপ্যাল গেজেট” এ (১৬.০২.১৯৩৫) নথিভুক্ত বিবরণে প্রকাশ পায়, বেশ কয়েকজন ভারতীয় কলা ও কারুশিল্পী এবং স্থাপত্যকলা বিশারদদের নাম, যাদের স্থাপত্যকলা, আলোকচিত্র, বাস্তব ও কারুশিল্প এবং ভাস্কর্যের নিদর্শন ওই প্রদর্শনীটিকে সমৃদ্ধ করে । তাদের মধ্যে অতি বিশিষ্ট বেশ কয়েকজনের নাম যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য, যথা:

শ্রী এন.সি.চন্দর (ডেপুটি ডাইরেক্টর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ); ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ; হায়দ্রাবাদ নিজাম এর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ; তৎকালীন গোয়ালিয়র ও ময়ূরভঞ্জ এস্টেট ; পি.ডাব্লিউ.ডি. কান্দ্রীর ; ইতিহাস সমৃদ্ধ জয়সলমেড়, জয়পুর, যোধপুর, বিকানের , উদয়পুর, চিতোর , আজমের শহর এর আলোকচিত্র ; জাপানি শিল্পী শ্রী কে.নাসু দ্বারা অঙ্কিত বৌদ্ধ দেয়াল-চিত্রণ (ফ্রেস্কো পেইন্টিং) ; ‘শিল্প-সিদ্ধান্তি’ উপাধি প্রাপ্ত শ্রী সিদ্ধালিঙ্গা স্বামী, রাজ্যশিল্পী মহীশূর এস্টেট ; বাংলা বিভাগে মহামহীম রায়বাহাদুর কে.এল.বড়ুয়া, মন্ত্রী আসাম এবং ‘স্কুল অফ ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার’ । আধুনিক বিভাগে যোগদান করেন ‘ত্রাভাশেকার স্কুল অফ আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট’ ; শ্রী জে.সি.ব্যানার্জি দ্বারা নির্মিত লক্শ্ণৌ রেলওয়ে স্টেশন এর বিশাল আলোকচিত্র, শ্রী এ.কে.আদিত্য- পি.ডাব্লিউ.ডি -হায়দ্রাবাদ ; ‘লক্শ্ণৌ স্কুল অফ আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট’ ; শ্রী পার্সী ব্রাউন, সেক্রেটারি এবং স্কুরেটর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ,কলকাতা (“ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার -বুদ্ধিষ্ট ও হিন্দু পিরিয়ড এবং ইসলামিক পিরিয়ড” দুই খন্ড বইয়ের প্রণেতা) । উপরোক্ত গেজেট এর বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে এক যুবা বাঙালির নামও । তার দ্বারা উদ্ভাবিত ও নির্মিত - অলংকৃত ইটের গাঁথনি, আধুনিক টেরাকোটা এবং সিমেন্ট রচিত নমুনা ইত্যাদি অত্যন্ত প্রশংসিত হয় । অনন্য প্রতিভা, নিষ্ঠা ও শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচায়ক এই যুবা মণিলাল রায়, শ্রী শ্রীশ চন্দ্র চ্যাটার্জির সুযোগ্য ছাত্র রূপে এই প্রদর্শনীতে যোগদান করেন ।

দিল্লি বিড়লা মন্দির রূপায়ণ এর ইতিহাস (১৯৩৩-১৯৩৮) : উপরোক্ত প্রদর্শনী, শেঠ যুগল কিশোর বিড়লা কে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে । প্রদর্শনী’র আহ্বায়ক ও সেই সময়ের আধুনিক ভারতীয় স্থাপত্য ও বাস্তুকলা আন্দোলনের পুরোধা এবং পথ প্রবর্তক শ্রী শ্রীশ চন্দ্র চ্যাটার্জির গুণ মুগ্ধ হয়ে পড়েন তিনি । তাঁরই শিষ্য শিল্পী শ্রী মণিলাল রায়ের প্রতিভা, শিল্প-জহুরি শেঠ যুগলকিশোরের চোখ এড়ায় না । ভারতীয় স্থাপত্য কলার অন্তর্নিহিত অপরূপ সৌন্দর্য দেখে তিনি ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যকলা’র পুনরুদ্ধার ও নব-সংস্কার সাধনের সংকল্প নেন । অচিরেই তাঁর সুঅভিপ্রায় মূর্ত রূপ পায় । জাপানি সন্ত, ভিক্ষু নিচিরেন এর স্বপ্নাদেশ সফল করার উদ্দেশ্যে তাঁরই শিষ্য, বৌদ্ধ ভিক্ষু নিচিৎসু ফুজি’র (১৮৮৫-১৯৮৫, গাঁধীজি প্রদত্ত নাম -‘ফুজিগুরু’) মহৎ আকাঙ্ক্ষা এবং আবেদনে শেঠ যুগলকিশোর বিড়লা এক কথায়, সাড়া দিয়ে কলকাতা’র লেক রোড স্থিত “নিপ্পন -জান্ন মাই-হোজি” নামক জাপানি বুদ্ধ স্তূপ সহ মন্দির গড়ে তোলার জন্য জমি সহ সব রকম আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন এবং স্থাপত্য শিল্প বিশারদ শ্রী শ্রীশ চন্দ্র চ্যাটার্জি কে মন্দিরের পরিকল্পনা’র ভার দেন । শ্রী শ্রীশচন্দ্র তার সুযোগ্য ছাত্র মণিলাল রায়ের সাহায্যে মন্দিরটির সফল রূপায়ণ (ফেব্রুয়ারী-১৯৩৫) এ সম্পূর্ণ করেন । এর পর দিল্লিতে, পবিত্র মদন মোহন মালব্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং আর্থিক সঙ্কট গ্রস্ত ‘হিন্দু মহাসভা মন্দিরের’ কাজে সাহায্যকারী শেঠ যুগলকিশোর বিড়লা’র ডাকে সাড়া দেন শ্রী শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জি । সঙ্গ দেন শিল্পানুরাগি শিষ্য মণিলাল রায় ।

নিউ দিল্লি, রিডিং রোড (অধুনা মন্দির মার্গ ) স্থিত ‘শ্রী সনাতন ধর্ম সভা’ নামে এক সমিতি, ভারতে গঠিত হয় । উদ্দেশ্যে অতি সৎ । সম্মিলিত ভাবে ধর্মালোচনা ও উপাসনার জন্য একটি বৃহৎ মন্দির,আনুষঙ্গিক সভাগৃহ, পাঠাগার ও ধর্মশালা নির্মাণ । দেশীয় হিন্দু রাজা ও জনসাধারণের কাছ থেকে প্রায় ষাট হাজার টাকার মত অনুদান সংগ্রহের পর দিল্লির রিডিং রোডে দুই কড় জমির ব্যাবস্থা হওয়ায় কাজ আরম্ভ হয় মার্চ ১৯৩৩ এ । মন্দিরের ভিত্তি- প্রস্তর স্থাপন করেন মহারাজ উদয়ভানু সিংহের (১৮৯৩-১৯৫৪) সুপুত্র রাণা নিহাল সিংহ, ঢোলপুর রাজ্যের শেষ জাট শাসক (১৯১১-১৯৪৯) । উক্ত জমি প্রচন্ড প্রস্তরময় ও অসমান থাকার দরুন প্রাথমিক স্তরে প্রস্তাবিত মন্দিরের জন্য সমতলীকরণ, নির্মাণ উপযোগীকরণ সহ মসৃণ ভূমি তৈয়ারিতেই সংগৃহীত সমস্ত অর্থ ব্যয় হয়ে যাওয়ায়, সমিতি বিপাকে পড়ে । ইতিমধ্যে সমিতির সংভাবনায় আকৃষ্ট হয়ে শেঠ যুগলকিশোর বিড়লা বাধাপ্রাপ্ত মন্দিরের, নির্মাণের যাবতীয় দায় দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন । অভিজ্ঞ স্থপতি শ্রীশ চন্দ্র চ্যাটার্জির তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক স্তরে দিল্লি বিড়লা মন্দিরের পরিকল্পনা ও নির্মাণ কার্য ১৯৩৫ সালে যখন, পুনরায় আরম্ভ হয় তখন বয়সে প্রবীণ এবং বয়োবৃদ্ধ শ্রীশ চন্দ্র চ্যাটার্জির বয়স বাষটি এবং শেঠ যুগলকিশোর বিড়লা’র বয়স পঞ্চাশ । মূল্যবোধ ও স্বাধীনচেতা এবং ভিন্ন বিচার ধারার অধিকারী, দুই বিশিষ্ট মানুষের মধ্যে, অভিব্যক্তি ও স্বার্থের সংঘাত অস্বীকার করা যায়না । তাই এরূপ বিশাল মন্দিরের সমতুল্য পরিকল্পনা,সমন্বয় ও কার্যসিদ্ধির মধ্যে বিস্তর সময় লাগার পরিপ্রেক্ষিতে, নতুন উদ্ভাবনা ও দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ, এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ।

বয়স ও স্বাস্থ্য জনিত কারণে দিল্লিতে টানা প্রবাসে অনিচ্ছুক প্রবীণ স্থপতি’র বদলে অপেক্ষাকৃত বয়সে নবীণ এবং দিল্লি প্রবাসে রাজী তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য, জাত শিল্পী মণিলাল রায় কে (বয়স ছাব্বিশ) তাঁর মেধা, শিল্প গুণান, প্রাজ্ঞতা, এবং শেঠ যুগলকিশোর বিড়লা’র সাথে পূর্ব পরিচিতির সূত্রে, পরবর্তী পরিকল্পনা ও মন্দির নির্মাণের কাজে নিয়োজিত করা হয় । অচিরেই তিনি শেঠজির অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আস্থা-ভাজন হয়ে ওঠেন । নতুন পরিস্থিতি উদ্ভূত কারণে, গভীর চিন্তা ও আলোচনা পরিশেষে, মন্দিরের পূর্ব পরিকল্পিত নকশায় বিস্তর পরিবর্তন ও পরিমার্জনার পর মন্দির নির্মাণের কাজ, অবিচ্ছিন্ন ভাবে, ত সম্পন্ন করার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যায় । অল্প সময়ই ,বিড়লা মন্দিরের কাজে দক্ষতার পরিচয় দেওয়ার কারণে সেই সময় নির্মীয়মাণ ‘হিন্দু মহাসভা’র দায়িত্বপূর্ণ কার্যটিও যুবা মণিলাল

রাসের উপরেই স্থ হয় । নির্মাণ কার্য (১৯৩৮) শেষ হওয়ার পর ‘বিড়লা মন্দিরের’ সাথে সাথে প্রবাসী বাঙালি হিসেবে তিনিও প্রচার-ছটায় আলোকিত হয়ে মন্দির বিশেষজ্ঞ হিসেবে রাতারাতি বিখ্যাত হয় পড়েন । বিড়লা মন্দিরের গঠন শৈলী : মূল মন্দিরের নাম “লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির” হলেও আসলে মন্দিরটি তিন তলা বিশিষ্ট, তিন সুউচ্চ শিখর যুক্ত মন্দিরটির মোট ভাগ তিনটি । সর্বোচ্চ শিখরের নীচে গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত । মন্দিরের অপর দুই গর্ভগৃহে ডান দিকে শিব আর বাঁ দিকেরটিতে দেবী দুর্গার মূর্তি অধিষ্ঠিত । মন্দিরটির জমির আয়তন ৭.৫ একডা (৩০.৩৫১ বর্গ মিটার) এবং মন্দির আচ্ছাদিত বা নির্মিত এলাকা প্রায় ২,১০০ বর্গ মিটার । মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৫০ ফুট, প্রস্থে ১২০ ফুট এবং আধার বা স্তম্ভ স্তর (প্লিন্থ লেভেল) ১২ ফুট উঁচু । উত্তর ভারতীয় “নাগারা” শৈলীর (হিমালয় থেকে বিজয়-পর্বত মালা অবধি প্রসারিত গুপ্তযুগ প্রবর্তিত, বিশেষ স্থাপত্য শৈলী) এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন- এই মন্দির । মন্দিরের বাঁ দিকের শেষ প্রান্তে বুদ্ধ স্তূপের অনুকরণে, অহিংসার বাণী প্রসার হেতু, একই সঙ্গে নির্মিত ও উদ্ঘাটিত হয়—সুদৃশ্য ওই বুদ্ধ মন্দির ।

..... [ “মন্দিরের গঠন ভঙ্গিটি ভারতীয় স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন । লাল পাথরের চূড়া, ধার গুলিতে আছে গৈরিক । মনে হয় যেন লাল জমিতে গেড়ুয়া পাড় । প্রাচীর গায়ে আছে অজস্র ফ্রেস্কো পেইন্টিং । জয়পুর শিল্প বিদ্যালয়ের শিল্পীরা অঙ্কন করেছে সেসব চিত্র । তাদের বিষয় বস্তু ও অঙ্কন চাতুর্য প্রশংসনীয় । জয়পুর শিল্প বিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ কোশল মুখার্জী- তিনি বাঙালী ; নব্য বঙ্গীয় চিত্র কলা’র উদ্ভাবক নন্দলাল, অসিত কুমার, সমর গুপ্ত প্রভৃতির সতীর্থ । বিড়লা মন্দিরটির পরিকল্পনায় আর একজন বাঙালি স্থপতির যথেষ্ট অংশ আছে একথা জেনে আনন্দিত হওয়ার কারণ ..... “দৃষ্টিপাত” লেখক-বিনয় মুখোপাধ্যায়-ছদ্মনাম-যাযাবর-১ম প্রকাশ-১৯৪৬) ]

মন্দিরের বৈশিষ্ট্য: ‘লক্ষ্মী-নারায়ণ’ মন্দিরের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ অনুধাবন যোগ্য যথা :

- ১) বিংশ শতাব্দীর দিল্লিতে, প্রথম এরূপ এক বিশাল মন্দিরের পরিকল্পনা, ‘স্বদেশী আন্দোলন’ের পটভূমিকায় এক বৃহৎ এবং মহৎ উদ্যোগের প্রথম সফল নিষ্পাদন,
- ২) দিল্লিতে এর আগে মুঘল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী প্রচুর স্মৃতিস্তম্ভ থাকা সত্ত্বেও বিড়লা মন্দিরের মতন কোনও বিশাল এবং রমণীয় হিন্দু শিল্পকৃতির প্রচেষ্টা এই প্রথম,
- ৩) তিনটি সুউচ্চ শিখর, তিনটি গর্ভগৃহ ও তিনটি পৃথক পরিকল্পনা সহ প্রথম মন্দির,
- ৪) প্রাচীন একক দেবতা/ দেবী অধিষ্ঠিত মন্দির গুলির জায়গায় একই সঙ্গে তিন তিনটি আরাধ্য দেব-দেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মন্দির,
- ৫) জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, ও কুসংস্কার মুক্ত প্রথম মন্দির,
- ৬) নির্দিষ্ট জনসমূহের বিচরণ যোগ্য বিশাল আভ্যন্তরীণ পরিসর ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ,
- ৭) দুপ্তবেশ্য এবং সংকীর্ণ গলিপথ বিশিষ্ট প্রাচীন মন্দির গুলির গর্ভগৃহের পরিবর্তে সুবিন্যস্ত গর্ভগৃহ সহ প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ যুক্ত প্রথম আধুনিক মন্দির,
- ৮) ধর্মের নামে পান্ডা বা পূজারির দৌরাভ্যাহীন প্রথম পূজা স্থল,
- ৯) পরিপ্রম যুক্ত প্রাচীন নির্মাণ পদ্ধতির বদলে, সরল ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার,
- ১০) প্রথম স্থানীয় নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহারে বাহুল্যতা, যেমন ইট, কনক্রিট এবং নিরেট শ্বেত পাথরের পরিবর্তে শ্বেত মর্মর আবৃত (ক্লাডিং) ইটের দেওয়াল, অন্দর ও বহিস্কায়ে জল প্রতিরোধক আধুনিক সিমেন্ট রং এর প্রথম শিল্পসম্মত ব্যবহার,
- ১১) প্রথম সহজ, সরল ও আধুনিক অঙ্কণ শিল্প দ্বারা দেওয়াল চিত্রণ (ফ্রেস্কো পেইন্টিং),
- ১২) দিল্লি বিড়লা মন্দির, ভারতীয় মন্দির স্থাপত্য শিল্পে এক নব জাগরণের প্রতিক এবং কালান্তরে দেশের নানা প্রান্তে, বিভিন্ন আধুনিক মন্দির স্থাপনে, প্রথম প্রেরণা স্রোত হিসেবে আজও সমাদৃত ।

উপসংহার: প্রয়োজক শেঠ যুগল কিশোর বিড়লা’র সক্রিয় ভূমিকা লব্ধ এবং মহাত্মা গান্ধী’র আশীর্বাদ ধন্য, দিল্লি বিড়লা মন্দির মূর্তরূপ পায়, প্রবাসী বাঙালি মণিলাল রাসের অসামান্য স্থাপত্য শিল্প ও সৃজনীশক্তির দৌলতে । পূর্ব বাংলার কুমিল্লায়, তাঁর জন্ম । হাইস্কুলের পর কলকাতায় বসবাস । কলেজ থেকে বেরিয়ে তখনকার সময়ের বিশিষ্ট স্থাপত্যকলা বিশারদ শ্রী শ্রীযচন্দ্র চ্যাটার্জির কিছুদিন শাগরেদি করার সময়েই যুগল কিশোর বিড়লা’র সুনজরে পড়ে যান ।

দিল্লি বিড়লা মন্দির নির্মাণের পর পন্ডিত ৮মদন মোহন মালব্য’র আগ্রহে, মণিলাল রাসের পরিকল্পনায় কাশী (বারাণসী) হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরে, গড়ে ওঠে নতুন ‘কাশী বিশ্বনাথ মন্দির’ (১৯৩৩-১৯৬৫) । তারপর, উত্তর প্রদেশের কানপুর স্থিত সেঠ যুগ্ম লাল কমলাপত্ এর (বাণীজ্যিক জে.কে. প্রতিষ্ঠান) মাতৃদেবীর স্বপ্নাদেশ সাকার করতে তৈরী হল কানপুরে, তিন শিখর বিশিষ্ট, ‘রাধাকৃষ্ণ মন্দির’ বা জে.কে.মন্দির (১৯৫৩-১৯৬০) । এরপর মোদিনগরে শেঠ গুজরমল মোদির (মোদি কন্টিনেন্টাল টায়ার খ্যাত ) আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার নিমিত্তে মোদিনগরে নির্মিত হল আর একটি ‘লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির’ (১৯৫৫ -১৯৬৩) । গোরক্ষনাথ মঠের, নাথ সম্প্রদায়ের মহন্ত দ্বিজয়নাথ এবং পরবর্তি মহন্ত রাজনীতিগত অবৈদ্যনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ জীর্ণসংস্কার সহ পুনঃ নির্মিত হল গোরক্ষপুরে বিশাল ‘গোরক্ষ-নাথজি’র মন্দির’ (১৯৬৩-১৯৭৫) । উঃ প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআদিত্যনাথজি গোরক্ষনাথ

মন্দিরের বর্তমান মঠাধ্যক্ষ । গুণমুগ্ধ প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদজির বাড়ি বিহারের বেগুসরাইয়ে গড়ে ওঠে এক পারিবারিক মন্দির, পূর্বোল্লিখিত ওই বাঙালি স্থপতির পরিকল্পনা ও কুশল তত্ত্বাবধানে ।

পূর্ব বাংলার (অধুনা বাংলা দেশ) বাস্তুভিটা ছেড়ে প্রথম জীবনে কলকাতা তারপর দিল্লি ও পরবর্তীকালে কানপুর প্রবাসী বাঙালি স্থপতি ও পরিকল্পক এবং বিড়লা মন্দিরের সে দিনের সেই প্রচার বিমুখ বঙ্গ সন্তান মণিলাল রায় (২৭.০৫.১৯০৯-২৯.১২.১৯৮২) এর নাম, দিল্লি বিড়লা মন্দির সংলগ্ন তিস্তাঙ্কের - শ্বেতমর্মর ফলকে উৎকীর্ণ আছে, যা আজও অমলিন এবং গর্বের সহিত অগণিত ভক্তজন ও পর্যটকের কৌতূহল নিবৃত্ত করে ।

তথ্য সূত্র:

- ১) “ক্যালকাটা শিমুনিসিপল্ গ্যাজেট”, ১৬ ই ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ ;
- ২) ইংরাজি দৈনিক ‘দি হিন্দুস্তান টাইমস্’ -২৭ এ জুলাই, ১৯৩৬
- ৩) দৈনিক ‘দি হিন্দুস্তান টাইমস্’ -১৯ এ মার্চ, ১৯৩৯ ;
- ৪) দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা – ১৯ এ মার্চ, ১৯৩৯ ;
- ৫) সপ্তিমেন্ট টু দি “ইন্ডিয়ন্ কংক্রীট জার্নাল্”-১৫ইমে, ১৯৩৯ ;
- ৬) দৈনিক “যুগান্তর”, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ (২৯এ মে, ১৯৩৯) ;
- ৭) “প্রবাসী”এলাহাবাদ - শ্রাবণ, ১৩৪৬ (জুলাই, ১৯৩৯) ।

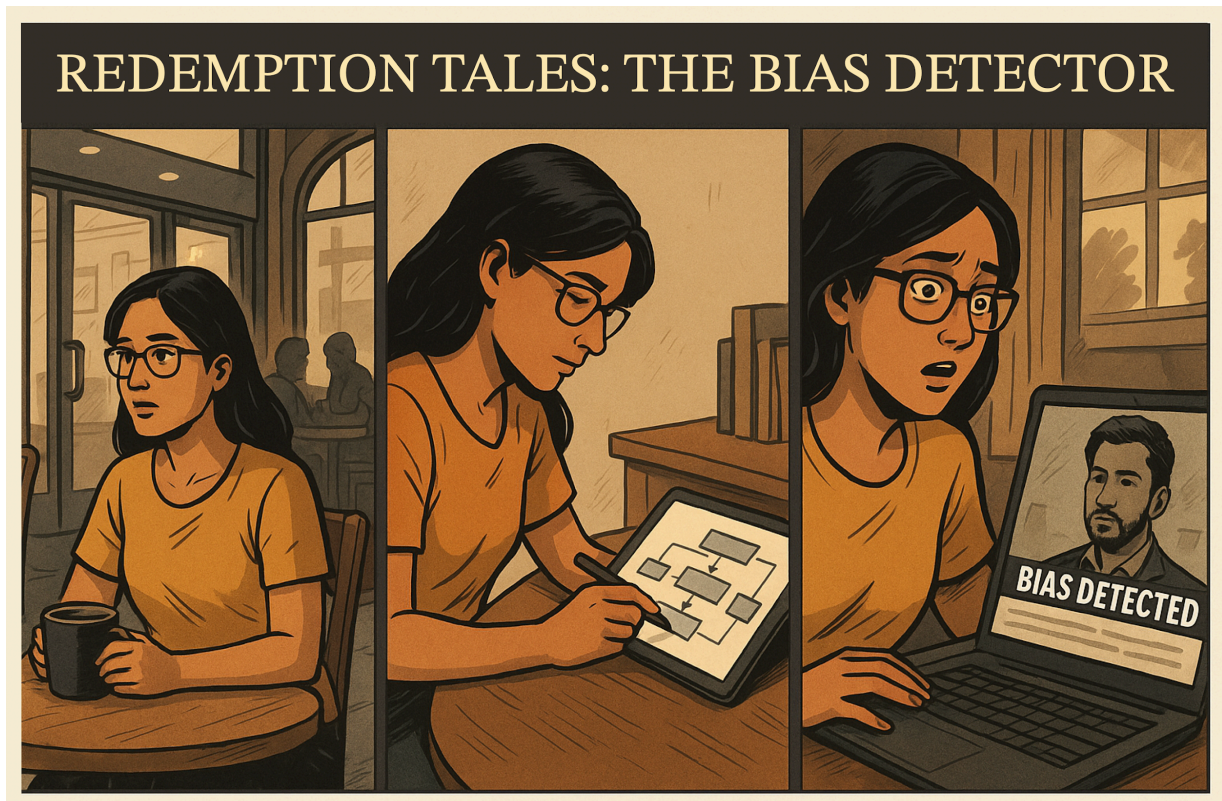
বি: দ্র: লেখক- নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর প্রাক্তন সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ।



*Kamal Roy is a retired civil engineer and architect. Active organizer in multiple Bengali associations like the Nikhil Bharat Banga Sahetya Sammelan*

# English Prose

## Redemption Tales: The Bias Detector



Manjushree Sorcar, or Manju as her friends called her, took a cautious sip from her cup of Americano as she eyed the entrance from her table right across it. Ahan Kaar was late as usual for their coffee date. He had been late quite a bit these past six months, and stressed out. But that was to be expected, for Ahan had become a celebrity since getting his Pulitzer six months back. He was the rockstar of the season at his news outlet, True News Corp, and had an invitation every day of the week to parties that mattered in his profession. Ahan had lately felt that he wasn't getting enough time with his spouse, Manju, and had scheduled a coffee date as an attempt to change that.

As she waited, Manju wistfully remembered her journey. It was fresh in her mind from that morning's breakfast chat with her 12-year old daughter Mishti.

"Mum, how did you come to this country?", asked Mishti.

“Well, to understand my immigration story, you will have to go back to the 1960s, before I was born. Much of this country’s infrastructure was built with a programming language called COBOL. At that time, computers were a new frontier, and as processes started getting digitized, we started storing data about all kinds of things. Now data was often about people, and as you might imagine, date is an important part of data. When people are born, when they transact, etc. Multiple generations of pioneering programmers chose to represent the year field in a date with two digits. For example, May 10, 1970 would be 05–10–70. Do you see a problem with this?”

“Wait, what would you do at the turn of the century?” said Mishti with a perplexed look.

“Exactly. That came to be known as the year 2000, or the Y2K problem. There was a second problem. Computer languages had evolved over the next few decades, and by the 90s, computer science graduates were learning languages like C, C++ and Java. They did not want to work with COBOL, which by then felt ancient. So programmers were hired all over the world to work on a problem the current generation of engineers didn’t care to solve. That is how I got my first opportunity right out of school,” explained Manju.

“But were they teaching you COBOL in school in India?,” asked Mishti.

“No. Our curriculum was on par with this country. I was very good in state of the art programming languages. However, the opportunity to get a paying job in this country was mostly around COBOL which the locals did not want to handle. So I started there,” said Manju.

“That sucks, mom, and it isn’t fair!” said Mishti.

“Well, before you feel sorry for me, know that most of us hired in the late 90s didn’t have to spend more than a few years on COBOL. After delivering on the Y2K problem in my specific project, I applied and got through a competitive Masters in Computer Science at a top school in the country. That’s where I met your dad. He was studying journalism as you know,” said Manju, with a hint of nostalgia.

Looking at the clock, Manju jumped, “Now, let’s get you to school before you get a tardy.” Mishti took a last bite of her sandwich and headed out the door into their car as Manju proceeded to drop her to school.

Ahan had seen his parents work very hard and always face a glass ceiling reserved for those who looked and spoke differently than them. He had decided to skip tech and focus on issues of social justice, and a joy in writing took him to journalism school where he was top of his class. Meeting the demure Manju in one of his jaunts at the engineering school cafeteria, he had liked her quiet reserved nature which was just the opposite of his boisterous and opinionated approach to life. On the last day of school, he proposed to her. They dated over the next year and married the year after. Two decades later, they were the proud parents of two children.

Manju had taken some time off from work to focus on her children when they were younger, and with the help of returnships, had slowly ramped back her programming career. Their joint income allowed for a full-time nanny who would bring the children home from school and drive them to after-school programs, but mornings were reserved for parent drop offs.

All of that balance seemed to have been tossed out the window the day Ahan won a Pulitzer for his reporting on the Brittonian model of childcare. Brittonia, a former colony of Great Britain, and independent over the last three decades, had implemented a childcare system where the entire neighborhood pitched



in to build a community around growing children. Even truant children of migrant workers in the neighborhood were held accountable for truancy, and as a result, everyone went to school, regardless of ability to pay. Crime would be almost non-existent in such neighborhoods. It was all deeply inspiring.

Ahan had not known a quiet night since the award, being catapulted into the royalty of journalism. Every journalistic board wanted him in it. Every media powerhouse wanted him to speak at their parties and events. And Ahan wasn't complaining. This recognition had come late, and he had worked very hard for it. He didn't think much about how Manju had managed a demanding career, orchestrated childcare for their children, supported him emotionally and taken care of their home. Until a close friend of his pointed it out. Filled with guilt, he had proposed a coffee date with Manju and insisted on it when she expressed her reservations about the timing. As Manju floated through these thoughts, the door to the cafe swung open, and in barged Ahan looking flustered. He saw her, and his expression turned to relief.

"There you are," he said, as though he had been searching all over for a truant guest.

"Yes, here I am, and have been here the last twenty minutes," said Manju gently.

"Oh dear! I am so sorry for being late..." said Ahan.

"That's alright.." began Manju, before Ahan cut her off.

"You won't believe what happened today! The CEO called us all and showed us examples of what is passing as journalism through social media. I am so disgusted by the amount of bias we are amplifying all the time."

"Tell me more," said Manju, genuinely interested.

"People don't seem to have the awareness that they are using words that clearly indicate bias toward one political position or another. Social media is rampant with this nonsense. Meanwhile, us journalists who have trained hard to avoid such bias are fighting to be relevant in a market whose economics has swung largely in favor of social media," rued Ahan.

"Want to get a coffee?", prompted Manju.

"Yeah, that's a great idea. Can you please order me a cappuccino while I stretch and catch my breath? Haven't stopped running since 7 am this morning!," requested Ahan.

"Of course," said Manju, as she got up to order it.

As she returned with the cappuccino in her hand, she noticed that Ahan was already texting.

"Who are you texting?," asked Manju.

"Oh, am writing to Mark. We need to get on the air and diss this hard," said Ahan. Mark was the CEO of True News.

Manju sighed. His mental bandwidth was going to be taken up by yet another crusade. Since she had known him, Ahan was always wrapped up in some cause or the other. She knew better than to talk him out of it. "If only your friends in tech could do something to autodetect bias on social media news," rued Ahan.

Something about this comment bothered Manju. Ahan hadn't thought Manju herself was capable of doing something here. He had probably meant to say "your industry." She tucked the slight in one corner of her mind and continued to hold space for Ahan's angst. Soon it was time to head home.

"Ok, this was great! We should do this more often. I gotta rush for the Journalism Round Table. They will give us dinner there. Will see you closer to 10 PM. Don't stay up for me," said Ahan.

"I won't. Am hoping this will slow down. The children miss you," said Manju.

"You know how this is. It is all a big burst right now, and at the 1 year mark of the Pulitzer, no one will remember my name once the new winners are announced," said Ahan philosophically.

Manju nodded. He was right. And yet, this was hard on the family. Manju picked up their empty coffee cups and threw them in the bin.

"Thanks, darling!," beamed Ahan as he rushed off to save society from its worst social media impulses. Manju summoned her car with her app, and was soon on her way home.

\* \* \*

That night, Manju was restless. The children were tucked in by 9 PM and she had another hour before Ahan returned. She had always been an audacious dreamer. One whose dreams were executed with quiet determination and no bombast. She had deeply empathized with Ahan's plight fighting to save society's conscience. What if she could be the one to find a solution? Yes, she had the background to do it. Having worked with cutting edge large language models, she knew a thing or two about the latest flavor of artificial intelligence. How would she go about tackling this?

Her mind went to an ethics class she had taken in school, out of idle curiosity. The professor was unorthodox. He had dared to teach a novel ethics class in the engineering school which was about building a personal ethical code that followed the engineer's creed: build once, use many times. In particular, she remembered one session where the professor had explored euphemisms and cacophemisms. She could not forget the way in which the professor had introduced these topics.

"Euphemisms are about making things seem better than they are. Cacophemisms are about making things seem worse than they are," the professor had said simply. Then, he proceeded to read about painful accounts of Nazi Germany and the ethical violations in which regular professionals participated. One episode stood out for her. She found herself combing the Wikipedia page about this episode (Aktion T4) to remember the details. She found the euphemisms and cacophemisms that enabled the deception lighting up as she read the section.

*In mid-1939, Hitler authorized the creation of the Reich Committee for the Scientific Registering of Serious Hereditary and Congenital Illnesses.*

This sounded like a legitimate scientific committee, except for the fact that its leaders 'were authorized to approve applications to kill children in relevant circumstances,' and details were left to subordinates. Three of a panel of four medical experts went through the registrations and approved the killing of children under the age of three 'suspected' of 'serious hereditary diseases'.

*The Ministry used deceit when dealing with parents or guardians, particularly in Catholic areas, where parents were generally uncooperative. Parents were told that their children were being sent to "Special Sections", where they would receive improved treatment. The children sent to these centers were kept for*

*“assessment” for a few weeks and then killed by injection of toxic chemicals, typically phenol; their deaths were recorded as “pneumonia”. Autopsies were usually performed and brain samples were taken to be used for “medical research”. Post mortem examinations apparently helped to ease the consciences of many of those involved, giving them the feeling that there was a genuine medical purpose to the killings.*

Manju couldn't breathe. She remembered having a similar experience when the professor had read it out in the class. She went to her garden, took several deep breaths and slowly regained her balance. She remembered something else her professor had read out, that these children had been described as “useless eaters,” a cacophemism for people with severe disabilities used by doctors to justify breaking the Hippocratic oath to rid the country of such people. This euphemistically named “euthanasia” program was the precursor to the adult euthanasia program that ended up murdering over ninety thousand people.

The Professor had even written a book about it with a former student, titled Ethics for the Real World, and she ordered it and read it cover to cover within three nights. She reminded herself of the exhortation to avoid value-loaded language, which people use to hide really bad action that would normally be hard to support.

A week after finishing the book, she suddenly sensed the emergence of an idea. With an open-source emotion detector module, Manju felt she could plumb large troves of news content and start to associate critical distinctions in that content with its underlying emotion. If a positive or negative emotion was associated with the distinction, and the underlying action was harmful, that would be a red flag. For instance, “Special Sections” sounds special, and who wouldn't want that. Who wouldn't want an “assessment” at such a center? And who would want “useless eaters” in their country? The underlying action of harming children could be identified and extracted from the general piece about such topics and one would then know that euphemisms and cacophemisms abounded. A value-neutral article would be one where such terms were mostly absent.

As Manju thought through the steps, her excitement kept rising. She went to her favorite Generative AI tool and put in the prompt “Detect euphemisms and cacophemisms in the article. On a scale of 1 to 10, grade how much the article uses euphemisms. On a similar scale of 1 to 10, grade how much the article uses cacophemisms.” She watched the results with wonder and added more prompts to improve the detection. Within an hour, she was pleased with the results and knew what to do next. Popping up her ideation app, she quickly sketched out the various components. She had finished putting in the last touches of her design when the front door opened and Ahan walked in. She closed her tablet and welcomed him with a big smile, hiding the master plan she had come up with. Ahan was weary, and after the customary hug, they both headed off to bed.

Two months from sketching out her idea, Manju had diligently put in 2 hours every day and brought something amazing to life. She had built a plugin that would work on any browser. It would detect if the user was reading a news article on a social media site, as also from a traditional news outlet. It would then flag the article for using euphemisms and cacophemisms.

She decided to call her plugin “Oblique” and put it out on various plugin stores. She created anonymous social media handles and tweeted about the plugin tagging personalities in the world of journalism. She studiously avoided tagging Ahan so that she would not be traced back. After the last tweet was done, she looked at the clock. It was midnight. She yawned with a sense of satisfaction. Ahan would be proud of this. Finally, shoddy news articles would be flagged and great journalists like him would come out smelling

like roses. She had to wake up at 6 to prepare the children's lunches. Wearily, she climbed into bed and slept well.

\* \* \*

Manju's smartphone buzzed in her meeting. She glanced at it and saw that it was Ahan. She tapped a quick response to let him know she'd call him later and went back to running her meeting. She had forgotten about last night. Could the plugin's downloads have picked up? There was another hour left for this meeting to end, and for her to head home. She somehow stayed focused and got through it. Right as the meeting ended, she locked herself in a small conference room and called Ahan.

"Hey, were you trying to reach me?", she said with a tone of excitement.

"Yeah, just letting you know that I will be eating at the office today," said Ahan.

"Why, what happened?," asked Manju, somewhat disappointed.

"We have a crisis. Someone's released a plug-in and it's devastating us," said Ahan.

"What!? What do you mean?," said Manju.

"Some smart alec put out a plugin to judge news content on bias. This plugin is now flagging all of my work and top media outlets, along with all the ragtag sources, and we don't have a way of explaining it. We are going to be in a war room mode to get into it," said Ahan.

Manju's heart sank. She rushed home wondering what bugs in her approach could have let that happen. She was a solid programmer who worked with great meticulousness. Leaders in her company always felt relieved when she was on the team. How could she have been careless about this? She realized that she made a big assumption — that the top media houses would obviously have content that did well with her plugin, and she had skipped testing their content.

She pulled into her driveway and rushed out. As she got online, she saw that social media was ablaze with the plugin. The reviews were endless, and they were all gushing about this "amazing plugin." Some of the reviewers were seasoned critics. Not to be distracted by this, she pulled up five of Ahan's top journalistic works and ran it by the plugin. Each one was flagged with bias. The plugin gave specific explanations for the flag, and as she read it, she was stunned. It had even flagged his Pulitzer-winning work!

Manju read every word that was flagged. What she had missed catching was that hiding in plain sight behind his exposition of the Brittonian community model of childcare was the exhortation to have this country's government tax neighborhoods higher if they didn't follow such a model. His argument was that the government would have to spend higher in such neighborhoods to deal with social inequities. He had used euphemisms like accelerating enlightened neighborhoods to justify the action of increasing taxes as punishment on those who didn't follow such a model. He had also used cacophemisms like freeloaders to describe those neighborhoods not paying what he thought were social dues.

Manju had an uneasy realization that in every one of Ahan's eloquent pieces of social justice, he had proposed interventions that were subtly coercive, hidden behind euphemisms and cacophemisms. There was no bug in her code. The plugin was working as intended. Along with the sharp and easy to detect bias of social media content, the plugin was catching deep rooted bias in the journalistic elite.

Manju did not know whether to feel thrilled or deflated. Her brilliance had shined through her plugin. It would give humanity a new path forward in how they received content. It would also destroy her spouse's career, along with so many other well recognized figures. And what did this mean about her own bias toward her husband? She had never been so confused in her life.



*Somik Raha works at the intersection of technology and philosophy. This piece aims to facilitate conversations on euphemisms and cacophemisms.*



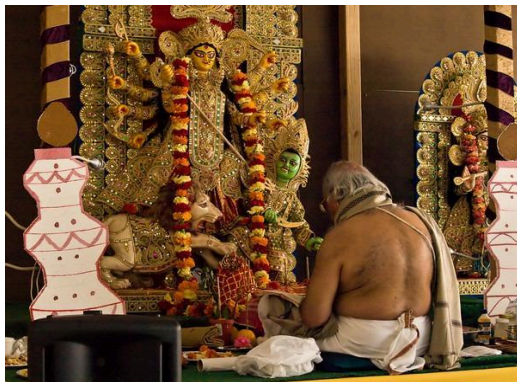
## In Conversation with Romen Chakrabarti

Writing the introduction to this piece has been the most challenging one for me: how do I introduce this person? He's known by all, our 91-year-old living archive, embodiment of Durga Pujo of San Francisco Bay Area, California. He is not just a "purohit," he is our very own Gandalf who not only performs the Durga Pujo but inspires and motivates us into spirituality. Reminiscing about the times when he would perform the pujo, Srabasti Mukherjee Gupta (Director of Cultural Programs and *Anjali*, Pashchimi) says, "He is my favorite. That's the first time I heard a Purohit explain mantras." Talking about how he connected with the audience by making them a part of the pujo, she remembers, "Simple things like Pushpanjali... he explained: 'Flowers are like the email server...that's a medium to send our wish to God. Another incident living in my memory: we say 'Horo papa, horo klesho...horo priye.' He explained that this means to take away sin but the last mantra doesn't imply taking away sin, it ends with addressing Durga as Shiva's priya!! So lovely. He inducted us into the beauty of such mantras." Yes, we are talking about none other than Romen Mesho, the first person to create the culture of Durga Pujo in the Bay area.

Now let's get straight to the interview:

**A: Tell us about your journey of coming to the US and starting Durga Pujo here.**

R: I came to the US in 1970; the date was 07/07/70. I knew Uday Shankar Sengupta, cousin of the owner of *Bartaman* newspaper; Uday was an architect by passion. So I asked him if he could paint Durga Thakur. Luckily, his partner would remodel homes and he made one from a door panel. My didi lived in San Francisco and we conducted the first pujo at her place, 360 Cumberland Street, near Dolores Park. The next year, Uday made Lokkhi, Saraswati. This time, we organized the pujo at 2650 Fulton Street, near Golden Gate Park at the Cultural Integration Fellowship and had around 80-90 people participating. With the passing of years, participation increased; we would organize the pujo at schools, churches, etc. Slowly, this club was named Prabasi and it continued for 19 years. When Prabasi was 19 years old, they brought an idol from India and then Prabasi got divided into Prabasi and Sanskriti. They would organize the pujo on 2 weekends covering Friday evening, Saturday and Sunday. When Pashchimi came into existence, the tradition of 5 days of Durga Pujo in the Bay Area began.



**A: Please tell us about the history of Pashchimi and 5 days of Durga Pujo.**

R: Livermore Hindu Temple would organize the 5-day Durga Pujo under the name, Ekata. Ekata then got divided into Ekata and Pashchimi. A person who came to visit his daughter from India started the 5-day Durga Pujo but could not come the second year for visa issues. I had to take over. We hosted it at the old Hindu Temple of Sunnyvale and then slowly Pashchimi got their own venue.

**A: What made you get involved in Durga Pujo?**

R: I had my *poite (the Brahminical thread)* when I was 8 years old. It was the year 1939, and there was an ongoing war. We went back to Barishal (now a part of Bangladesh) where we had a mandir in our house. I learned to do the pujo from my kaka (father's younger brother). When I came back, I would help at my friend's place and slowly got involved in Durga Pujo. After coming here, there was nobody to do the pujo. I became the first "purohit" because the existing temples too did not have any Bengali purohit/priest. People had no inkling about the whole process; I made a detailed chart which has been used by many here.

**A: What changes have you noticed in Durga Pujo from your era to this age?**

R: The number of pujos has increased, there is more financial contribution, the idols get recycled. In my time, there was scarcity of purohits. Alok Chatterjee would do pujo along with me. Now the number has increased.

**A: With so many Durga Pujos and so much participation, would you call California equals to Kolkata now?**

R: Yes, absolutely.

**A: How did you get associated with Pashchimi?**

R: When Pashchimi started, there was scarcity of purohits. I was with Sanskriti then. Pashchimi approached me. I agreed, provided there wasn't a scheduling conflict. So they did it on two different weekends. Pashchimi had the 5-day pujo and I needed help since it is impossible for one purohit to do pujo for 5 days. Debashish Banerjee came to help me and then others joined. .

**A: What does spirituality mean to you?**

R: For me, spirituality is not about asking things from God, but about telling God, I am trying my best, but if I get stuck somewhere, please help me.

**A: I'm sure there would have been scarcity of resources in conducting Durga Pujo when you first started it. Please tell us how you managed it.**

R: Resources were not important; what's important is the desire, the love, the affection with which we conduct the pujo. The very fact that we could do the pujo while being so many miles away from home, that's important. We would replace bel pata with another leaf; what mattered is the intention because God resides in all of us. We love God in forms of our mother, father, siblings; we seek blessings from God in the same way we seek blessings from our elders.

**A: What is one memorable moment of working with Pashchimi?**

R: The very fact that I could do the pujo for 5 days and it began with Pashchimi is the most memorable moment for me. People from Kolkata would taunt us, "you have a day and a half of pujo." For the first time, we started having our own 5 days' pujo.

**A: For Pujo, many fear doing the wrong thing, yet some say God is most forgiving so we should not fear. What is your school of thought? Did you have similar fears and how did you overcome them?**

R: There is nothing as the wrong thing. It's more like "as specified in the books." So we modify it. I never feared. I tell the Goddess, "you are already 14 thousand miles away from home, would you not be modified?" These days the idols are getting modified so much, why can't we modify? These are all fine as long as the core is solid.

**A: Do you think practising pujo regularly has changed your way of life?**

R: Yes; I was never into partying. I was always interested in pujo and wanted to know more about Hindu Dharma. After I graduated from school, I went to study at Ramakrishna Mission Vidyamandir and learned a lot about Ramakrishna. From that time onwards, I was seeking knowledge about our Hindu religion. My wife, who passed away a year and a half ago, was my companion on this journey. God is the same in every religion, only the representations are different.

**A: Please share a message with our readers.**

R: Please try to listen to the mantras and watch the pujo performance. The mantras used in our Durga Pujo are mostly Sanskritized Bengali ( except for the ones we do during “ Ghatasthapan” (the ritual of placing the “ghat” and preparing it for pujo). If you hear it repeatedly, you will understand the meaning. There are a lot of diversions but I will urge everyone to spend some time in front of Durga Ma, listening to the mantra and observing the rituals.

# The Two Lives of Pumpkin: A Gourd's Journey Through Ayurveda

When autumn rolls in, most people see pumpkins and think: Halloween, lattes, pie. I see a pharmacy. A lineage. A memory.

Because in Ayurveda, a pumpkin—**Karkaru**, as it's classically known—isn't just a vegetable. It's a teacher. And like the best teachers, it doesn't stay one thing. It evolves.

Here in the Bay Area, the light softens. Farmers' markets burst into hues of saffron, sage, and sunset. Sugar pumpkins pile up next to sturdy butternuts. There are plump heirlooms posing like showgirls and wild thorny gourds that refuse to be tamed. It's a gourd extravaganza. But behind their cheerful exteriors lies one of Ayurveda's most quietly profound truths: everything changes with time, even a pumpkin.

**A Sloka With Bite:** Ayurveda's sages weren't ones to waste words. This Sanskrit verse packs an entire lifecycle into a single breath:

*Kūṣmāṇḍī tu bhṛśaṃ laghvī karkāurapi kīrtitā |  
karkāruḡrāhiṇī śītā raktapittaharā guruḥ |  
pakvā tiktāgnijanāni sakṣārā kaphavātnuta ||*

Translated:

- **Kūṣmāṇḍī** (young pumpkin) is extremely light to digest—cooling, soothing, gentle
- **Karkaru** (mature pumpkin) becomes absorbent, cooling, heavy, and helps calm bleeding disorders
- **Once ripe**, it transforms again—turning bitter, igniting digestive fire, and becoming a friend to sluggish Kapha and scattered Vata

**So, Is It Light or Heavy?** It depends on when you meet it.

- In its youth, the pumpkin is like a quiet breeze on a hot day—cooling, light, kind to inflamed tissues.
- By the time it ripens, it carries weight, depth, and fire. It becomes food that fuels and focuses, especially in the colder months.

This is why I love Ayurveda. It doesn't trap anything in a single identity. Not a gourd, not a human being.

**More Than a Fruit: A Whole-Plant Symphony:** Ayurveda has a soft spot for the “discarded parts”—the peels, leaves, bits that get trimmed and tossed. With pumpkin, every part is an invitation.

- **The Blossoms:** Oh, the blossoms. Delicate, golden, and short-lived, they're best dipped in a batter of rice and chickpea flour, sprinkled with nigella seeds and salt, and then fried till they whisper of festivals.
- **The Leaves and Stems:** These green treasures are earthy and bold. Sautéed with ridge gourd or eggplant, they taste like a farewell to summer.
- **The Peel:** In my Bengali childhood kitchen, the peel was not compost—it was dinner. Stir-fried with mustard oil, it had its own place at the table.
- **And the Fruit Itself:** Tender and cooling when young, sturdy and stimulating when mature. Roast it, steam it, blend it—it meets you where you are.

**Kitchen Memory: From Kolkata to California:** In our North Indian Bengali home, we cooked with the seasons and the senses. My grandmother didn't need to consult a cookbook to know when to pluck the blossoms or save the peel.

We made savory curries with *shada kumro*, the white-skinned unripe pumpkin. Ripe pumpkin sweetened our mixed sabzis. Blossoms crackled into golden fritters. Leaves folded into ridge gourd. Even the skin had a role.

Years later, when I planted pumpkins in my Bay Area backyard, they grew like they remembered something I'd forgotten. Vines sprawling, blossoms blushing, fruit hiding under wide green leaves. I've since found pumpkin leaves in Mountain View and Saratoga farmers' markets—tender, fresh, full of promise. And so, I carry those flavors into my Californian kitchen, one season at a time.

**Eating With the Season (and With Sense):** Next time you pick up a pumpkin, ask yourself: what do I need right now?

- **Heavy, sluggish, Kapha-style blah?** Go for the ripe stuff. Roast or bake it. The bitterness and alkalinity will nudge your Agni awake.
- **Overheated, scattered, inflamed?** Simmer young pumpkin into a soothing soup. Let its tenderness cool you down.
- **Feeling festive?** Don't stop at the fruit. Fry the blossoms. Tear the leaves. Save the stems. Honour the whole plant, not just the celebrity part.

**From My Kitchen: Pumpkin Leaf Medley With Dal Fritters:** This dish tastes like October. It smells like home. It feeds the body and satisfies the part of the soul that remembers to not waste a thing.

## Ingredients

- ½ cup yellow split peas (motor dal), soaked overnight
- 1 ridge gourd, chopped
- ¼ pumpkin, chopped
- 1 potato, chopped
- ½ eggplant, sliced
- ½ bunch pumpkin leaves, torn
- Stems from the pumpkin leaves
- Mustard oil (or another high-heat oil if Pitta-sensitive)
- Salt
- Turmeric
- Nigella seeds (kalonji)

## Method

1. **Dal Fritters:** Drain the soaked dal. Add a pinch of salt, ¼ tsp turmeric, and ½ tsp nigella seeds. Mix and shape into small balls. Shallow fry until golden. Set aside.
2. **Vegetables:** Chop ridge gourd, pumpkin, potato. Slice the eggplant, coat in turmeric and salt, set aside. Tear pumpkin leaves by hand.
3. **Cooking:** Heat mustard oil in a wok. Fry the eggplant until soft, remove. In the same wok, add nigella seeds—let them dance. Toss in the potato, pumpkin, ridge gourd, and turmeric. Sauté. Once the ridge gourd begins to release water, add the torn pumpkin leaves and their stems. Salt

to taste. Cover and cook until nearly done. Add back the eggplant and dal fritters, give everything a gentle stir, and let it come together.

4. **To Serve:** With steamed rice, this dish is complete. But if you want a full thali experience, pair it with thin red lentil soup (*musuri dal*) and squash blossom fritters on the side.

**A Gourd's Wisdom:** Karkaru reminds me that nourishment isn't static. What begins as cooling becomes grounding. What starts out light becomes sturdy with time.

So yes, go ahead and carve pumpkins or sweeten them into pies. But also remember their deeper gift: the quiet medicine of seasonality, of cycles, of never wasting a single part.

Because in the end, the pumpkin doesn't just feed your body. It teaches you how to live.



*Geetanjali Chakraborty is Ayurveda Doctor Level Certified by the National Ayurvedic Medical Association, practicing in the Bay Area for over a decade. She leads workshops, teaches internationally, and offers care through her private practice (swakitch.com) and a donation-based clinic at the India Community Center, Milpitas.*



# Pashchimi Poets

## সিঁদূরপথ

একই ছাদের তলায় কেমন জং ধরেছে ভয়ংকর,  
বলছে লোকে সুখের আগল, বাস্তবে ঠিক অহং ঘর,  
মানুষ কেন এমন জেদী?  
মেঘ করেছে গগনভেদী,  
স্পর্শতে যে তুফান ছিল, তাতেই এখন দহন স্বর!  
সিঁদু চোখের তারায় কেমন রুদ্রপ্রতাপ বর্ণা,  
ছন্দপতন আসন্ন আজ, ভুল সময়ের ঝড় না...  
চেঁটা যতই থাকুক প্রেমে,  
জমছে ধুলো আগের ক্রেমে,  
পাশাপাশি থাকছে দুজন, কিন্তু পরস্পর না!  
বৈবাহিক এ নৌকো ডোবে, ভাসছে মনের দুধার তো,  
একটা বুক আজও পাথর, অন্যটা হয় উদার তো!  
মিলছে না আর চোখের পলক,  
দূরত্ব সেই মাইলফলক,  
হৃদয় যতই শূন্য থাকুক, শরীর তবু ক্ষুধার্ত!  
সময় শুধু স্পর্ধা খোঁজে, পরকীরার চেক কাটা,  
বার্ষিকীতে কেউ আসে না, মিথ্যে ছিল কেক কাটা,  
কাল্লা ভরে শ্রাবণ মাসে,  
খেলছে দুজন জীবন তাসে,  
ট্রাম্প করে যায় দুই পরাণই, জিতবে কে হয় টেক্সাটা?  
হৃদয় চিরকালীন বোকা, মন খোঁজে না বিদূর মত,  
বৃষ্টি ভেজা দুটো শরীর, কাছেই তবু কী দূর পথ!  
স্পর্শ আগে আগুন দিত,  
এখন উঠোন জীবন্তুত,  
আনন্দগান ফুরিয়ে গেলে শুষ্ক হবেই সিঁদূরপথ!

মাস্তুল



Arunasish Som is a writer alongside being a software engineer. He has few published books on novels, poetry, stories etc.

## ফিরে এসো বিনয়

[বিখ্যাত কবি বিনয় মজুমদার কে উৎসর্গ করে লেখা]  
বিনয় তুমি অগ্রস্থিত মায়াজালে  
ধূসর পাণ্ডুলিপির মায়াময় মধুর টানে  
ফিরে এসো বিনয়  
আজও রেল গাড়ি চলে তোমার ঘরের পাস দিয়ে  
তোমার অপেক্ষায় বন্দি সময়  
যেদিন তুমি থাকতে বসে শূন্য দৃষ্টিতে  
অনামা প্লাটফর্মের শেষ সীমানায়  
সেদিন ও রেল গাড়ি যেত  
তোমার অপেক্ষায় ছিল বন্দি সময়  
ফিরে এসো বিনয়  
আজও আছে পাণ্ডুলিপি নেই শুধু বিনয়  
প্লাটফর্মের শেষ সীমানায়  
যে আঁকা বাঁকা পায়ে চলা পথ  
আজও পড়ে আছে পথিকের আশায়  
অঘ্রানের অনুভূতি মালার টানে  
ফিরে এসো বিনয়।



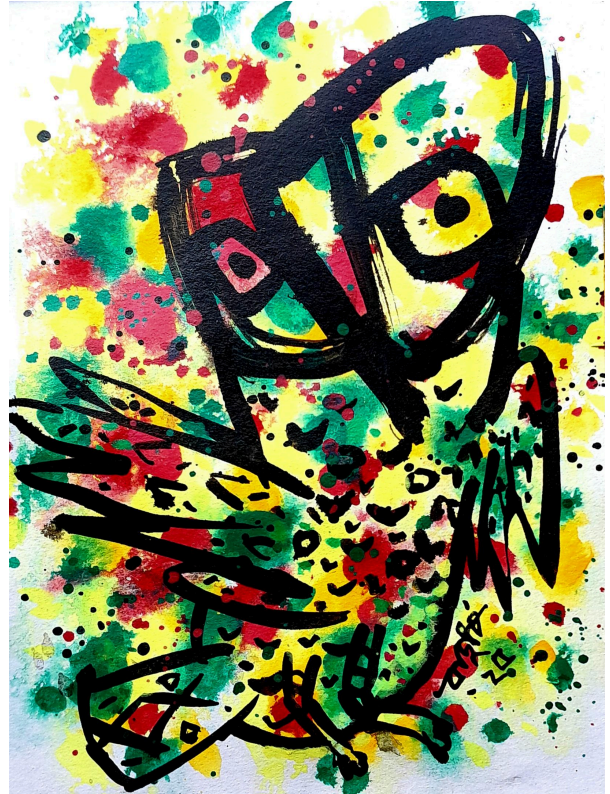
## দীপ নিভে যায়-----

দীপ নিভে যায় তারায় তারায়  
স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে  
ভাসিয়ে বেড়ায় আলোক বর্ষ কণিকায়  
সেদিন জ্বলে ছিল তোমার আশায়  
দীপ নিভে যায় গোধূলি তারায়  
কাল বেলা ক্ষনিক আসে আলোর পিপাসায়  
কবে তুমি আসবে ফিরে স্ফোটিক সঙ্ক্যায়  
দীপ নিভে যায় তারায় তারায়  
অফোটা অন্তরিক্ষে জ্বলে প্রেমের শিরায় শিরায়  
দীপ নিভে যায় তারায় তারায়  
যে হলুদ বসন্ত সঙ্ক্যায়  
ফুলোসজ্জা ঘিরে ধরে নদীর কানায় কানায়  
স্বপ্ন গ্রাস করে লৌহ জিউভায়  
স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে  
ভাসিয়ে বেড়ায় উত্তপ্ত জ্যোৎস্নায়  
রাণীখেতের অরন্য অল্লেশনের পিপাসায়  
লেলিহান ক্ষুদার অনন্ত গ্রিবায়ে  
দীপ নিভে যায় তারায় তারায়।

*Rajarshi Chattopadhyay is a contemporary fine artist, writer, sculptor, storyteller, and poet, working across both print and digital media. He graduated from the Government College of Art & Craft, Kolkata, in 1996.*

# Pashchimi Picassos

## Decorative Owl Art of Bengal



*Rajarshi Chattopadhyay is a contemporary fine artist, writer, sculptor, storyteller, and poet, working across both print and digital media. He graduated from the Government College of Art & Craft, Kolkata, in 1996.*

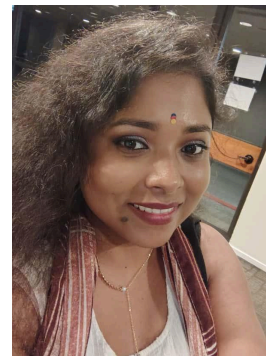
## The Calm Before the Storm of Rudra



*Aparna Ganguly is the Director of Marketing at Rhombus Power and enjoys being an amateur thespian*

## Back Cover

By Debasmita Paul



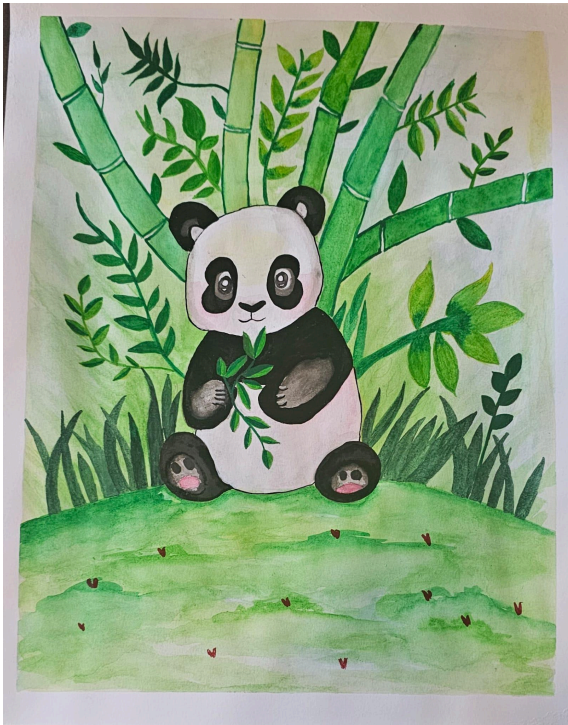
*Debasmita Paul is a neurobiologist from AIIMS New Delhi and currently a postdoctoral fellow at Stanford. She likes to spend her leisure time painting, sketching, singing, and dancing. She is greatly influenced by art works of Jamini Roy and Monet*



## Mini Picassos/Kids' Corner



*Cover page by Sreedatri Suter (3rd grade)*



*Happy in the Greens - water color*



*Aaron Das, age 7.  
This painting has been published in the National  
Anthology of Celebrating Art contest*



*The mountain rests in stillness, majestic and pure like nature's crown.*



*Aarna Sharma, 13*



*The lone wolf, etched in quiet power.*



*Aryan Sharma 16*



